বেতার বাংলা

পৌষ-মাঘ-১৪৩০

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন মহান বিজয় দিবসে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও তাঁর সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানা ঢাকায় বঙ্গভবনে মহান বিজয় দিবসে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিদের সাথে কেক কাটেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা এসময় উপস্থিত ছিলেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

পৌষ-মাঘ ১৪৩০ ● ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
মো. রাশেদুল হুদা সরকার

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে এসেছে শীত। বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যের অন্যতম আকর্ষণ শীত ঋতু। পৌষ-মাঘ এই দুইমাস বাংলা বর্ষপঞ্জির শীতকাল। শীত শুধু দুটি মাস নয় – একটি জীবনধারা, সংস্কৃতির বিশেষ রূপের আকর। সৃজন-চিন্তনের এক বিশেষ লগ্নও বটে। এ ঋতুতে ঘটে নতুন রূপ-রস-গন্ধের প্রাণ-প্রকৃতির সাথে মানুষের নতুন মোলাকাত। শীত তার নিজের মতো করে মানুষকে আবাহন জানায়। বাংলা কাব্য-কবিতায় কেন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীত চিত্রিত হয়েছে রিক্ততা, প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতা, বিরহ কাতরতার প্রতীক হিসেবে। কিন্তু শীতকাতুরে বাঙালির কাছে শীত আসে কুয়াশা-শিশির আর যাপন-উৎপাদন-উদ্‌যাপনের এক বিশেষ সংস্কৃতি নিয়ে। কবিগুরুর ভাষায়- 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে/আয়রে চলে আয় আয় আয়/ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে/মরি হায় হায় হায়।' বার মাসে তের পার্বণের বাঙালির কাছে শীত মানেই নানারকম বাহারি পিঠা-পুলির আয়োজন- খাদ্য-ব্যঞ্জনার নানা বৈচিত্র্যের সমাহার। মেলা, কবিগান, পালা গানের আসরসহ নানা উপকরণে মেতে ওঠে বাংলার প্রান্তর। কুয়াশাঘেরা শীতের সকালে খেজুর-রসের মৌ-মৌ গন্ধে ভরে থাকা আমাদের গ্রামীণ প্রকৃতি আমাদের নতুন করে মনে করিয়ে দেয় বাঙালির মননের ঐশ্বর্যের কথা।

১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ দশ মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থেকে এই দিনে নিজের দেশে ফিরেছিলেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁর আহবানেই হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিটি মুহূর্তেই এই জাতি অনুভব করে তাঁর অস্তিত্ব। কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক। মূলতঃ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা-আমাদের বিজয় অর্জন সম্পূর্ণ হয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকারের হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে আজ আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার আমাদের সবার।

মহান বিজয় দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং শুভ বড়দিন উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সাহিত্যের শীত বনাম জীবনের শীত
ড. কুদরত-ই-হুদা ৩

মহানায়কের প্রত্যাবর্তন
মাসুদ করিম ৭

ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, শুভ বড়দিন
ম্যানুয়েল সরকার ১১

জন্মদ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মোহাম্মদ আজম ১৪

আবহমান শীতের মৌসুমে প্রিয় এই বাংলা
আরিফা খানম ১৮

জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
মোহাম্মদ শাহজাহান ২৪

পৌষ সংক্রান্তি উৎসব
ইসমত আরা পলি ২৭

শীতের গ্রামবাংলা
মঈনুল হক চৌধুরী ৩০

আমাদের কৃষি ৩৯

গল্প

সম্পর্ক
মজিদ মাহমুদ ২০

শুচি
কেতন শেখ ৩২

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৫৫

বেতার সংবাদ ৬৩

বেতার অ্যালবাম ৭১

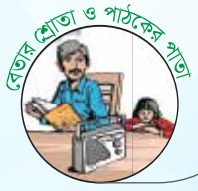

৭৫

বেতার পর্ব

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৪৮

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৫০

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ ৫২

কবিতা

শিশিরভেজা শীতের কবিতা
জহীর হায়দার ৬

শীতভোরে মন পোড়ে
সোহরাব পাশা ৬

শীতের দিনগুলোতে
নভেরা হোসেন ১০

শীত আসবে বলেই
রফিকুল ইসলাম ১০

১০ জানুয়ারি, তিনি এলেন
শাহজাদী আঞ্জুমান আরা ১৩

মেঘের খামে আসেনি চিঠি
মমতা মজুমদার ১৩

আমরা মানুষ
মৌরুসি মঞ্জুষা ২৩

কখনো তুমি
ফওজিয়া হালিম অনু ২৩

হেমন্ত যেই শেষ হলো ঐ
শাহান আরা জাকির ২৩

তরুপল্লব

শাস্তি (জাপানের লোকগল্প) ৪৩

গাঁয়ের শীত
সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম ৪৪

শীতের সকাল
শাহ আলম বিল্লাল ৪৪

শীত কাহন
জসিম উদ্দিন খান ৪৪

দুষ্ট শিকারি ও চালাক শিয়াল
ইব্রাহিম জুয়েল ৪৫

রাগ
শামীম শাহাবুদ্দীন ৪৬

ভাঁপা পিঠার ঘ্রাণ
সাঈদুর রহমান লিটন ৪৬

হিম
সুবর্ণা অধিকারী ৪৬

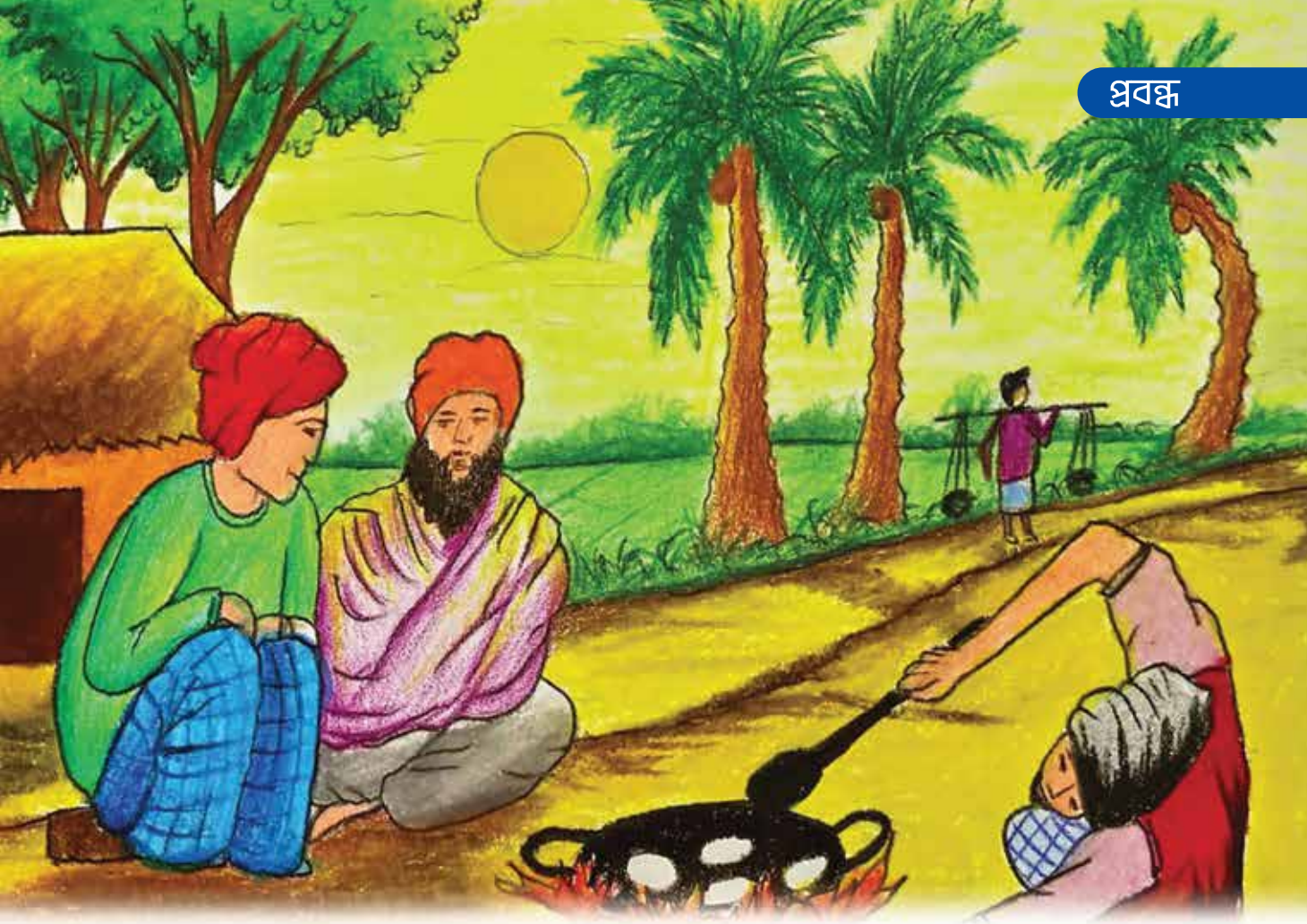

সাহিত্যের শীত বনাম জীবনের শীত

ড. কুদরত-ই-হুদা

একটা ঋতু মানে শুধু দুইটা মাস না। আদতে তা একটা জীবনধারা; যাপন-উদ্‌যাপন, সংস্কৃতির বিশেষ রূপের আকর। এমনকি একটা ঋতু মানে তো সৃজন-চিন্তনের এক বিশেষ লগ্নও বটে! ঋতুর পালাবদল মানেই নতুন রূপ-রস-গন্ধের প্রাণ-প্রকৃতির সাথে মানুষের নতুন মোলাকাত। অথবা এ যেন পুরোনো খোলস বদলে ফেলে নতুন খোলসে ঢোকার এন্তেজাম।

প্রত্যেকটা ঋতুই তার নিজের মতো করে মানুষকে আবাহন জানায়। শীত ঋতুও জানায়। কিন্তু বাংলা কাব্য-কবিতায় কেন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীত চিত্রিত হয়েছে রিক্ততা, প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতা, বিরহ কাতরতার প্রতীক হিসেবে। বাংলায় শীতকালে উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়। এ নিয়ে বাংলা কবিতায় 'উত্তুরে বায়', 'উত্তরে হাওয়া' বলে একটা কাব্যিক বিরহী ইডিয়মই যেন তৈরি হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অধিকাংশ কাব্য-কবিতায় এপথেই হেঁটেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের শীত ঋতু তো শুধু রিক্ততায় ভরা না। কেন বাংলার শীত বাংলার কাব্য-কবিতায় স্বরূপে উপস্থাপিত হয়নি সে এক ভিন্ন গবেষণার বিষয় বটে!

এক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে চারপাশের প্রাণ-প্রকৃতিকে সর্বতোভাবে আস্বাদনের একটা ব্যাপার চিরকালই ছিল। একারণে যে-রবীন্দ্রনাথ বাংলার শীতের মধ্যে রিক্ততাকে প্রধানভাবে দেখেছেন তিনিই আবার কোথাও কোথাও বাংলার শীতকে তার অন্য স্বরূপেও আবিষ্কার করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন শীতের মধ্যে একটা আবাহনের ব্যাপারও আছে। লিখেছেন,

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয়রে চলে আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগবধূরা ধানের খেতে
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে
মরি হায় হায় হায়।'

শেষে রবীন্দ্রনাথ ওই একই রচনায় যা বলেছেন তা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। বলছেন,

'ধরার খুশি ধরে নাকো ওই যে উঠানে
মরি হায় হায় হায়।'

মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, পৌষ-মাঘ মিলে বাংলাদেশের যে-শীতকাল, তা শুধু রিক্ততা আর বিরহবোধের নয়। এটি পূর্ণতারও বটে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধ বইয়ের 'আষাঢ়' শিরোনামের লেখায় দারুণভাবে বিষয়টিকে খোলাসা করেছেন। বিভিন্ন ঋতু নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, হিন্দুর চতুর্বর্ণবিভাগের সাথে বাংলার ছয় ঋতুরও মিল আছে। ছয় ঋতুর বর্ণ বিভাজনে তিনি শীতকে বলেছেন 'বৈশ্য'। কারণ, 'তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্‌যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।' শরত আর হেমন্তে যে-আয়োজন শীতে তার পরিণতি ও সমৃদ্ধি। শীত হচ্ছে, 'সংবৎসরের প্রদান বিভাগ'। ফলে শীত রিক্ততার ঋতু এই বিবেচনা বোধ করি একদেশদর্শী রোমান্টিক বিবেচনা দিয়ে ভরা। বাস্তব জীবনপ্রবাহের সাথে এর মিল অত্যন্ত অল্পই।

শীতের শুধু যে ফসলের সম্ভার আছে তা নয়। বাংলাদেশে শীত মানে রসেরও সমাবেশ। আমাদের কৈশোরে দেখেছি শীতের শুরুর আগেই ধারালো রাম-কাটারি, দা, নতুন ধার-ওঠানো ছেনি কোমরে ঝোলানো বাঁশের ঠুঙ্গির মধ্যে নিয়ে ঝমঝম শব্দ তুলে গাছী চলেছে সারবাঁধা খেজুর গাছের দিকে। উদ্দেশ্য গাছের মাথা পরিষ্কার করা। সারা বছর জমে ওঠা খেজুরের ডালপালা-আবর্জনা পরিষ্কার করে করে গাছী ঠিকই অব্যর্থভাবে পৌঁছে যান সেইখানে, যেখানে রসের সমাবেশ ঘটে আছে। গাছী যেন হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা। পিছে তার এক দঙ্গল কিশোর-কিশোরী। কী চায় তারা! গাছ পরিষ্কার করতে করতে এক পর্যায়ে বের হয় চুরমি। খেজুর হয়ে ফুঁড়ে বের হবার জন্য সবে জমাট বাঁধতে চলেছে যে সাদা-সাদা কাণ্ড তাই-ই চুরমি। ঈষৎ রসালো ও হালকা মিষ্টি সেই চুরমির লোভে পিছু নিয়েছে ছোটোরা। শুধু তাই না, খেজুরের ডাল দিয়ে তাদের বানিয়ে তুলতে হবে বাহারি সব ঘোড়া। এইসব ঘোড়া নিয়ে গ্রামের প্রধান সড়ক আর মেঠোপথের আল ধরে তাদের ছুটতে হবে সারাদিনমান। গাছী গাছ ঝুড়তে ব্যস্ত। আর নিচে ঊর্ধ্বমুখী ছেলেমেয়েদের উৎকণ্ঠা। মাঝেমধ্যে চোখের মধ্যে পড়ছে আবর্জনা। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সময় কোথায়! মাথার উপর খেজুরের ডাল পড়ে কি না তাও দেখার যেন ফুরসত নেই। কখন গাছী উপর থেকে ফেলবে সেই অমৃত-স্বাদের চুরমি আর ঘোড়ার গ্রীবার মতো বাঁকানো শক্তপোক্ত ডাল! কে পাবে আর কে পাবে না সে এক মহাদুশ্চিন্তার ব্যাপার বটে!

ওই গাছীর ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। গাছের পর গাছ তাকে পরিষ্কার করে তুলতে হবে। এরপর কোনো একদিন শুরু হবে খেজুর গাছের মাথার কোনো এক অংশের গভীরে যাওয়ার পালা। সেখান থেকে প্রতিদিন হালকা পরত কাটতে কাটতে একসময় বের হবে রস। বাঁশের নলি ঢুকিয়ে রসকে হাঁড়িতে জমানোর ব্যবস্থাপনা। সে এক প্রযুক্তিই বটে! সারারাত ফোটায় ফোটায় রস পড়ে ভরে থাকবে হাঁড়ি। খুব সকালে সারারাতের শিশির পড়ে পড়ে বিপজ্জনকভাবে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া গাছ বেয়ে বেয়ে উঠে চলবে রস সংগ্রহের পালা। শীতের কাঁপুনির মধ্যেও সকালের ওই ঠান্ডা রস খেয়ে আরো কাঁপুনি না উঠলে যেন গ্রামের ছেলে-বুড়োদের চলেই না। রসে ভেজানো পিঠার কথা না হয় নাই-বা বললাম। রস জ্বালিয়ে গুড় বানিয়ে তোলা সে তো আর এক যজ্ঞ! এই গুড় শুধু তো গুড় নয়। অনেকের জন্যে তা থালা ভরা সাদা সাদা ভাতের প্রতিশ্রুতি। এই তো শীতের বাংলাদেশ! এই তো বাংলাদেশের শীতের সংস্কৃতি। ফলে শীত মানে শুধু রিক্ততা আর বিরহানুভূতি– একথা একদেশদর্শীই বটে।

অন্য দেশের কথা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশে শীতের একটা আলাদা সমৃদ্ধি আছে। সেই সমৃদ্ধি কেবল ফসলে আর রসে নয়। শীত আমাদের রান্নাঘর পর্যন্ত নিজের প্রভাবকে বিস্তারিত করে তোলে। মাঠ যেন হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহস্থের হেঁসেলে। লাউ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, পালং শাক, মূলা, শালগম, মেটে আলু– কী নেই বাঙালির শীতের হেঁসেলে ও খাবার প্লেটে! শুধু মাঠের কথাই বা বলি কেন। বিলঝিলও যেন খলবলিয়ে ওঠে খাবারের পাতকে ভিন্ন মাত্রা দেয়ার জন্য। অগুনতি হাওড়-বাওড়-বিলঝিল থেকে উঠে আসতে যেন অস্থির হয়ে ওঠে বোয়াল, শোল, কই, শিং, মাগুর, পুঁটি, মেনি, তপসে মাছ, বাইন, গজার, মহাশোলসহ বিচিত্র সব মাছ। লাউ, শিম, কপি, পালংয়ের সাথে বোয়াল, কই, শোল মাছের কাদাকাদা ঝোল সারারাতের ঠান্ডায় জমে ওঠে। সকালে ভাতের সাথে সেই জমাট তরকারি মিশিয়ে না খেলে গ্রাম-জনপদের মানুষের কি চলে! শীতের বিচিত্র সবুজ সবজি আর বিলঝিলের গা-ভরা মাছ বাংলাদেশের খাদ্য-সংস্কৃতিকে বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে।

অনেকেরই জানা থাকার কথা, পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশে মাছের সাথে পর্যাপ্ত সবজি ব্যবহার করা হয়। এটি বাংলাদেশের বাঙালির খাদ্য ও রন্ধন-সংস্কৃতির বিশেষ একটি দিক। পশ্চিমবাংলায় যেমন মাছের সাথে সবজির মিশ্রণ অচল। সেখানকার খাদ্য ও রন্ধন-সংস্কৃতিতে শুধু মাছ নতুবা শুধু সবজি। পশ্চিমবাংলায় যুগ যুগ ধরে বসবাসরত পূর্ববঙ্গীয়দের হেঁসেলে মাছ ও সবজির এই মিশ্রণ দেখে সহজেই নাকি চিনে নেয়া যায় যে তারা বাংলাদেশাগত। এমনকি বাজার করতে গেলে কে কোন দোকানে কী কিনতে যাচ্ছে তার গতিবিধি দেখেও অনেকে বলতে পারেন কে পশ্চিমবঙ্গীয় আর কে পূর্ববঙ্গীয়। তবে কি বাংলাদেশের বাঙালির খাদ্য ও রন্ধন-সংস্কৃতির এই বিশেষ ধরনে শীতঋতুর পর্যাপ্ত মাছ আর সবুজ সবজির সমারোহের বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে!

পিঠাপুলির বিশেষ ঋতু শীত। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাথে সংস্কৃতির যে-সম্পর্ক এটা ঠিক তাই। শীত যেহেতু নতুন ধান ঘরে ওঠার ঋতু সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই কৃষকের খাদ্যতালিকায় উঠে আসে বিচিত্র নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি বিচিত্র পিঠাপুলি। রসের পিঠা, কুলি পিঠা, ভাপা পিঠা, সেয়াই পিঠা– নামের কি আর ইয়ত্তা আছে! আর নবান্নের উৎসব তো আছেই। ঋতুর সাথে উৎপাদনের ও তজ্জাত খাদ্যাভ্যাসের এই নিবিড় সম্পর্ক খুব কম ঋতুর মধ্যে লক্ষ করা যায়।

এ তো গেল খাদ্য-খাবার-রন্ধন সংস্কৃতির সাথে শীতের সম্পর্ক। সুপ্রাচীনকাল থেকেই শীতের সাথে বাংলাদেশের মানুষের চিত্তবৃত্তির সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। শীতের রাতে মোড়লের দহলিজে বা গৃহস্থের উঠানে উঠানে, কাছারিতে কাছারিতে চলে পুঁথিপাঠের আয়োজন। কবিগান, পালাগান, গাজিরগীত, যাত্রাপালা, ওয়াজ মাহফিল, বিচারগান, মুর্শিদাগান, মারফতি গান, বিচ্ছেদিগান সব জমে ওঠে প্রধানত এই শীতের রাতেই। বাঙালির সমবেত সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপন শীতের আগমন ছাড়া যেন অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। সাংস্কৃতিক উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠানের অনেকগুলো বাংলার গ্রামে গ্রামে এখনো চালু আছে। ফলে শীত বাংলাদেশে খালি বিরহ আর রিক্ততায় বিচ্ছিন্নকারী ঋতু নয়। শীত আনন্দে, উদ্‌যাপনে, সৃজনে, উপভোগেও সমাবিষ্ট করে।

দুই

শীতের সাথে বাংলার মানুষের যাপন-উদ্‌যাপন-কর্মের এই বহুবিচিত্র সম্পর্ক আধুনিক কবিদের কাব্য-কবিতায় খুব একটা স্থান পায়নি। অসহনীয়তা আর বিশুষ্কতার বিবেচনায় শীতকে একটা বিশেষ টাইপের মধ্যে আটকে ফেলা হয়েছে। শীত রিক্ততার ঋতু– এটা সম্ভবত শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবিষ্কার। নিজস্ব একক আবিষ্কার বলাও বোধ করি মুশকিল। শীত সম্পর্কিত এই অনুভবের বোধ করি একটা উৎস আছে। সেই উৎস ইউরোপ। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার শিরা-উপশিরা বেয়ে শীতের এই ধারণা বাংলার কাব্য-কবিতায় স্থান লাভ করেছে বলে মনে হয়। ইউরোপে শীত মানে শূন্যতা, রিক্ততা, তীব্র অসহনীয় আঘাত, বিচ্ছিন্নতা। সেখানকার কাব্য-কবিতায় শীত তাই বিশেষ কোনো উদ্‌যাপন-সৃজন-ভোগ-উপভোগের ব্যাপার নয়। বাংলার প্রকৃতিতেও শীত ঋতুতে একটা শূন্যতা কাজ করে– একথা সত্য। ঝরে যায় গাছের পাতা। ইউরোপের মতো না হলেও দারিদ্র্য ও এলাকাভেদের কিঞ্চিৎ কাঁপন জাগায় বৈ কি। কিন্তু বাংলাদেশে 'এহোঃ বাহ্য'। আগেই দেখিয়েছি বাংলাদেশে শীত জনজীবনের সাথে আরো আরো কত বিচিত্র

কর্মবিন্যাস ও তৎপরতার সাথে যুক্ত। তবে কি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কবিদের সৃষ্ট কাব্য-কবিতা জনজীবনের যাপনের ব্যাকরণের সাথে গভীরভাবে যুক্ত নয়! অন্তত শীতের রূপায়ণের প্রশ্নে অনেকটা তাই মনে হয়। একেই কি তবে সাহিত্যের ঔপনিবেশিকতা বলে! বাংলা কাব্য-কবিতায় শীতের যে-রূপায়ণ তার একটা বড় অংশ কি তবে উপনিবেশবাহিত! তবে তো শীতেরও পূর্ব-পশ্চিম আছে। আছে সাদা-কালো পর-অপর।

তিন

বদলই পৃথিবীর ধর্ম। কথাটা জড় ও জীব উভয়ের ক্ষেত্রেই খাটে। পরিবর্তনের নিয়মে পৃথিবীর জলবায়ুর চরিত্রেও ব্যাপক বদল ঘটেছে। জানা যায়, পৃথিবীর অনেক দেশে এক সময় বরফ পড়ত। এখন আর পড়ে না। এটা অসম্ভব নয় যে, পৃথিবীর অনেক দেশের এক বা একাধিক ঋতু নাই হয়ে গিয়েছে। ঋতুও রাক্ষস-খোক্কসে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও কি কোনো কোনো ঋতু একটু একটু করে গিলে খাচ্ছে বা খাব খাব করছে কোনো কোনো ঋতুকে! আজকাল বাংলাদেশে কি শীতের বিস্তার ও প্রভাব-প্রকোপ কমেছে! শিল্পায়ন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, পুঁজির বিকাশ আর সংস্কৃতির রূপান্তর কি তবে সমানুপাতিক!

প্রবাদ তো জীবন ও যাপনেরই নির্যাস। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে– 'এক মাঘে শীত যায় না'। আবার আছে 'মাঘের শীতে বাঘ পালায়'। 'শীতের বুড়ি' বলেও একটা কথা আছে। বুড়ি যেমন বয়োভারে ন্যুব্জ হয়ে যায়, জবুথবু হয়ে যায়, তেমনি কি বাংলার শীত এক সময় এই মুলুকের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে কাবু করে ফেলত! অথবা শীতের প্রকোপ কি এত তীব্র ছিল যে, বাঘও জনারণ্য থেকে পালিয়ে জঙ্গলে থাকাই নিরাপদ সাব্যস্ত করত! অথবা ওই যে বলা হচ্ছে, এও কি এক বাস্তব ছিল যে, বাঙালির জীবনে যা বিপদ তাই-ই মাঘের শীত! নিশ্চয়ই এইসব প্রবাদের সাথে বাঙালির যাপন-সত্যের একটা নিবিড় যোগ ছিল। কিন্তু এখন কি ওইসব প্রবাদ-কথার পুরোপুরি বাস্তব ভিত্তি আছে! বাংলাদেশের শীতকে কি গ্রীষ্ম ক্রমাগত গ্রাস করে নিচ্ছে না! মরুভূমি যেমন তার জিহ্বা দিয়ে ক্রমাগত আশপাশের সবুজকে মরুতে রূপান্তরিত করে ফেলে তেমনি গ্রীষ্ম কি তার বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে শীতের দিকে!

তবু একথা তো এখনো সত্য যে, প্রাকৃতিক নিয়মে এখনো বাংলার প্রকৃতিতে শীত আসে। শীত আসে কুয়াশা-শিশির আর যাপন-উৎপাদন-উদ্‌যাপনের এক বিশেষ সংস্কৃতি নিয়ে। এই বিশেষ যাপন-উৎপাদন-উদ্‌যাপন সংস্কৃতির মধ্যেই বাংলাদেশের শীত ঋতু অপরাপর পৃথিবীর শীত ঋতু থেকে বিশেষ হয়ে উঠেছে এবং আরো বহুকাল বিশেষ হয়ে থাকবে বলে মনে হয়।

লেখক : গবেষক ও শিক্ষক

শীতভোরে মন পোড়ে

সোহরাব পাশা

পৃথিবীতে শীতের শুশ্রুষা নেই, প্রিয় হাতগুলি
ছুঁয়ে থাকে অন্য প্রিয়হাত,

ভাঙাচাঁদ বুঝিনি কার জন্যে
হৃদয়ে আবছায়া মেঘের ছায়া ফেলে
বেদনার ঘাসফড়িং ওড়ে
রাত্রির শিশির ভেজা কুয়াশার ঘাসে ;

কোনো কোনো দিন মাঝরাতে বাঁশঝাড়ে
জোছনার বৃষ্টি নামে, মুখর হাওয়ায় কাঁপে
স্মৃতির স্নিগ্ধ বকুল
শিউলিতলায় কাঁপে তোমার চোখের হাসি
ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস কী যে মুগ্ধ ভালোবাসাবাসি।

পুরনো পথের পাশে বুনোফুল-কতো অবহেলা
জোড়াতালি দেয়া জীবনের ছেঁড়া গল্প
ওইসব দৃশ্যশিল্পে নিভে যায় আজ
সব আলো -ভুলে যাই নিজস্ব বাড়ির-
পথ জ্যামিতি ভূগোল,

কোন এক শীতরাতে কেউ কেউ ভুলে ছিলো পথ
অন্ধকার-কুয়াশায়। আজও কী তারা খুঁজে ফেরে
হারানো স্মৃতির ঘ্রাণ!
শোনে কী এখনো নগরের কোলাহল
শীতভোরে আকাঙ্ক্ষার রোদে
খোলা জানালায় লাবণ্যের প্রিয় চোখ!

শিশিরভেজা শীতের কবিতা

জহীর হায়দার

স্মৃতির শহরে এখন
সুন্দর এক শীত নেমে এসেছে--
মনোরম ওই শীত এখন ধীর পায়ে
হেঁটে হেঁটে
নীরবে আমার
সমগ্র মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে:

কবিতার এ শিশিরভেজা শীত এখন আমার
আত্মার পরম এক বন্ধু,
হ্যাঁ, মাধুর্য ভরা এই শীতই আমার
আলোকিত জীবনের বন্ধু হয়ে উঠেছে:
আর হ্যাঁ, চোখ মেলেছি তাই বারবার-
চোখ মেলেছি অসংখ্যবার আমি

শুধু নিশ্চুপে দেখেছি চেয়ে:
রঙিন-স্মৃতির এই শীতকে ঘিরে

উদ্যানের সংগীতমুখর ফুলেরাও আজ আনন্দিত খুব,

হৃদয়স্পর্শী এই শীত আমার যৌবনের কাছে ভালোবাসা চেয়েছিলো,

হ্যাঁ, শীত চেয়েছিলো, পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা
চেয়েছিলো-- অনন্ত যৌবনের প্রেম,
তবে, সত্যিই বলছি আমি:
হারানো স্মৃতির এ শীতকে আমি
ফিরাতে পারিনি কখনোই,

ফিরিয়ে দিতে পারিনি শীতের অদ্ভুত ওই ভালোবাসাকে----

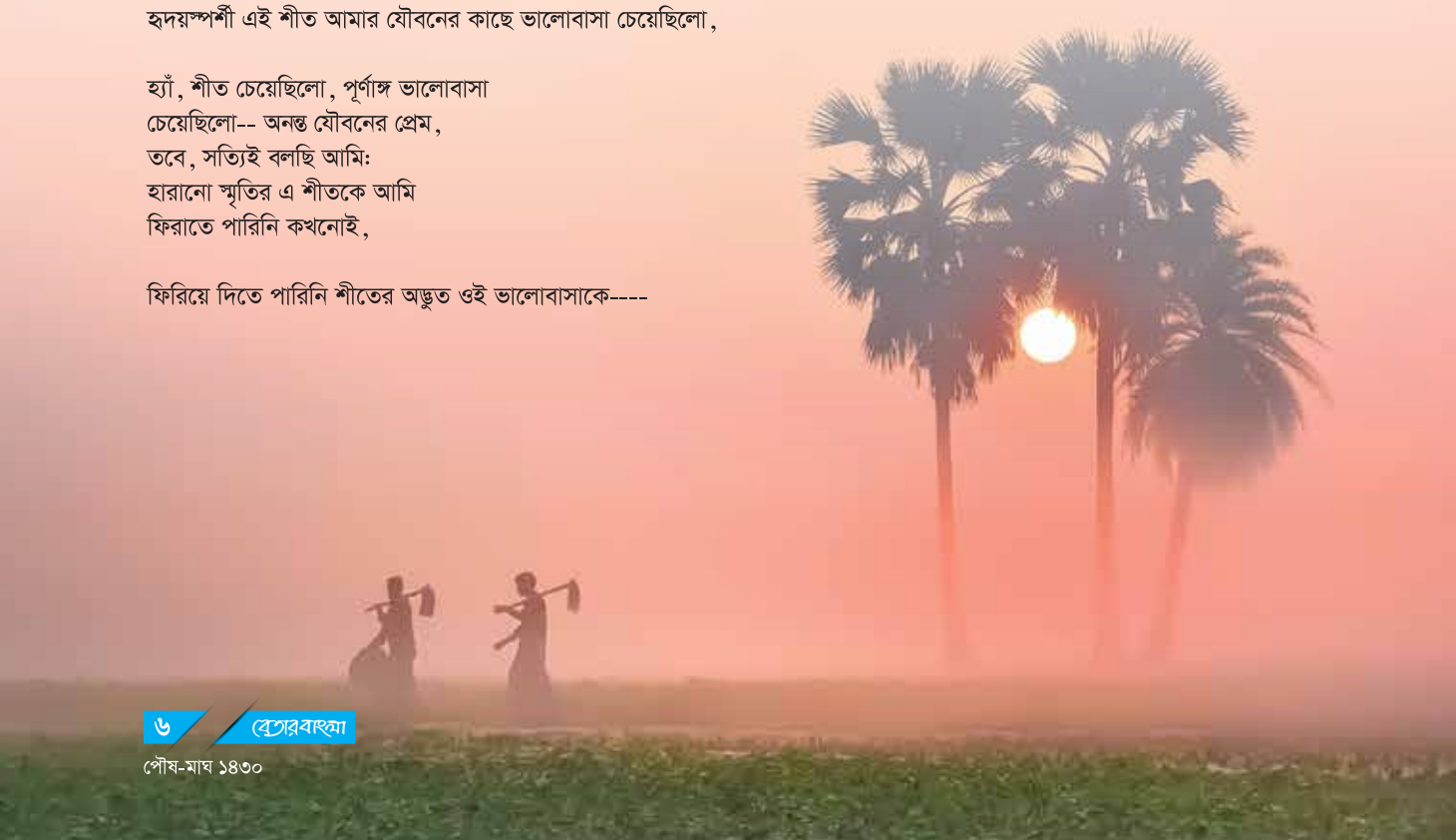

মহানায়কের প্রত্যাবর্তন

মাসুদ করিম

কোনও জাতির গোটা জনসমষ্টি যার নির্দেশনায় দিশা পায় তিনিই ইতিহাসের মহানায়ক। স্বাধীনতার অভীষ্ট অর্জনে বাঙালির ধারাবাহিক সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমন নেতৃত্বই দিয়েছিলেন। তিনি তাই ইতিহাসের মহানায়ক। আঁধার রাতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

উপমহাদেশে ভিনদেশী শাসকদের শত শত বছরের শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতার কাল অতিবাহিত হয়েছিলো একদিন। তার নাতিদীর্ঘ কাল পর ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হলো দেশ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো। দূরবর্তী দুই ভূখন্ড পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালিকে মুক্তি দিতে পারলো না। বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বুকে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষা চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তৎকালীন শাসকদের মনোভাব দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে পীড়িত করে। রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজেদের মধ্যে রেখে দেবার পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের প্রবণতা বাঙালিকে উদ্বিগ্ন করেছিলো। তার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক আন্দোলন হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, বৈষম্যমূলক শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতির মধ্যে বাঙালির মানসপটে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন লুকিয়ে ছিলো; সেটা অনেকেই অনুধাবন করলেও দৃঢ়তা, সাহস এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ইতিহাসের ক্ষণজন্মা মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান নামে পরিচিত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি উচ্চারণ করেন ইতিহাসের অমোঘ বাণী এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা তাঁকে জাগরণের পথিকৃৎ করে। কারণ তিনি বাঙালির মনের বাসনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গোটা জাতিকে যেভাবে তাড়িত করেছিলো, শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠ তাতে দিয়েছিলো চেতনার আলোকবর্তিকা। আঁধার রাত্রি পেরিয়ে দিগন্ত রেখায় আলোর সন্ধান। ফুল হয়ে ফোটে সকল কলি। আর শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন হ্যামিলনের এক বাঁশিওয়ালা। পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে এ কেমন বাঁশিওয়ালা ! যার বাঁশির সুরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তার জীবন দিতেও কুণ্ঠা করে না। এক অবিস্মরণীয় দীক্ষা ছিলো তাঁর নেতৃত্বে যা পাকিস্তানি শাসকদের দম্ভকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। শেখ মুজিব পাকিস্তানি শাসকদের বড় শত্রুতে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় মহানায়কের স্থান লাভ করেন। তিনি যে বলেছিলেন, 'বাঙালি জাতিকে দাবায়া রাখতে পারবা না'; সেই সত্য উপলব্ধি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দমন পীড়নের পথ বেছে নেয়। পোড়ামাটি পথ অবলম্বন করে।

'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়, মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান

সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারস।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :

এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্ন লিখিত একটি বার্তা পাঠান:

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দি করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ে উল্লেখিত এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শেখ মুজিব বাঙালি জাতিকে এতটাই ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন যে, সেই ইস্পাত কঠিন ঐক্যের সামনে নিষ্ঠুরতার পথ ছিলো বিপদজনক। তাই পাকিস্তানি শাসকেরা শেখ মুজিবকে বন্দি করতে এমন কি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পথেই হেঁটেছিলো। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে বাঙালি জাতির ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে দখলদার বাহিনী। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বার্তা পাঠায়, পাখিটি এখন খাঁচায় বন্দি।

বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে রাখা হলেও তাজউদ্দিন আহমেদসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভারত গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে কলকাতায় পাকিস্তান মিশন বাঙালি কূটনীতিক হোসেন আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান। তারপর বাঙালি কূটনীতিক শিহাব উদ্দিনসহ দিল্লিতেও কয়েকজন পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। শত্রুকে মোকাবেলা করে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে সহায়তা করেছেন তা অভাবনীয়। এই অর্থে কিছু রাজাকার ও আল-বদর ছাড়া বাংলাদেশের আপামর জনগণ সবাই মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। শরণার্থীদের ঢল নেমেছিলো। ভারত সীমান্ত খুলে দিয়ে সহায়তা করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে ঢাকা ক্যান্টমেন্টে রাখা হলো। এপ্রিলের শুরুতে তাকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁকে রাখা হয় মিয়াওয়ালি কারাগারে। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বিচারের প্রহসন চলেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র বাদী হয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে। প্রহসনের বিচার হলেও বিবাদী পক্ষের আইনজীবী রাখা হয়েছিলো। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন প্রখ্যাত আইনজীবী আইয়ুব বক্স ব্রোহি। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাঁকে। কারাগারের কাছেই কবর খোঁড়া হয়েছিলো। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। মিয়াওয়ালি জেল বঙ্গবন্ধুর জন্য নিরাপদ ছিলো না। মিয়াওয়ালি পরাজিত জেনারেল নিয়াজির নিজ বাড়ি। নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর তার প্রতিক্রিয়া হলে সমস্যা হতে পারে। তাঁকে কারাগারের ডিআইজি শেখ আব্দুর রশিদের বাসভবনে স্থানান্তর করা হয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর আদেশে সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে ২৬শে ডিসেম্বর নেয়া হয় রাওয়ালপিন্ডির কাছে সিহালা অতিথি ভবনে। ২৭ ডিসেম্বর হলো ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি না দিয়ে উপায় নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে আটকে পড়েছেন পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দি। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ছাড়া যুদ্ধবন্দিদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো। ভুট্টো কিছুটা সময় নিলেন সিদ্ধান্ত জানানোর জন্যে। যদিও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা তখনও দূর হয়নি। ফলে মুক্ত হলেও স্বাধীন দেশের খোলা হাওয়া এই মহানায়কের কবে জুটবে সেই অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হতে চায় না। ৩১শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমদ। তিনি জানালেন, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে জনমত যাচাই করবেন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো। তবে রাজনৈতিক এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। কারণ এই মহান নেতাকে তখন আর যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের কারাগারে আটকে রাখা দেশটির জন্যে দুরুহ কাজ। কারণ শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয়, বরং গোটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও ইতিহাসের অবিসংবাদিত নেতাকে নিজের স্বাধীন ভূখন্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা করেছিলো। আজিজ আহমদ এও বলেন, শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের, আন্তর্জাতিক কোনও কর্তৃপক্ষের নয়। তাই পাকিস্তানের বিমানেই তাকে পাকিস্তান ছাড়তে হবে।

আজিজ আহমদের প্রস্তাব, ইরান, তুরস্ক

কিংবা লন্ডন হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে উড়ে যেতে পারেন। বঙ্গবন্ধু লন্ডন হয়ে আসার প্রতি সম্মতি জানালেন। লন্ডনে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বাংলাদেশের লোকজন অপেক্ষারত ছিলেন। ১৯৭২ সালের ৩রা জানুয়ারি করাচির জনসভায় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে স্বদেশে পাঠানোর সম্মতির কথা জানান ভুট্টো। বঙ্গবন্ধু সিহালা অতিথিশালায় বসে সেইসব খবর জানতে পারেন। ৭ই জানুয়ারি ১৯৭২। প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্য নৈশভোজের আয়োজন করলেন ভুট্টো। তারপরই পাকিস্তানের পিআইয়ের ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডনের পথে যাত্রা শুরু হবে। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও ভুট্টো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দর কষাকষির চেষ্টা করেন। ভুট্টো বলেন, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যৌথভাবে করা যায় কিনা। শিথিল হলেও একটি কনফেডারেশন করা যায় কিনা। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমাকে আগে দেশে যেতে হবে। মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগ করলো। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় জানালেন জুলফিকার আলি ভুট্টো।

বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান কাক ডাকা ভোরে হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছল। একদিনের যাত্রা বিরতিকালে বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত সময় কাটান। প্রধানমন্ত্রী হিথ ও বিরোধী দলীয় নেতা উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট তার একান্ত সাক্ষাৎকার নেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানানোই উদ্দেশ্য। ১৯৭২ সালের ৫ই জানুয়ারি তারা ঢাকা থেকে রওনা হন। পরের দিন দিল্লি গিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথমে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ। তারপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সঙ্গে বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ। সেদিনই সন্ধ্যায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মানে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নৈশভোজ। পরের দিন ৭ই জানুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ভারতের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারা হলেন কৃষিমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদ, অর্থমন্ত্রী চ্যবন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, শিল্পমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী, সেচমন্ত্রী কে এল রাও। সবাই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে অধীর অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হবে কখন সেই ক্ষণ গণনাও চলছিলো। মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষার সময়টা ছিলো ভিন্ন এক অনুভূতির আবেশ জড়ানো। মৃত্যুঞ্জয়ী মহানায়ককে অভিবাদন জানাবার অধীর অপেক্ষার অবসান যেন কাঙ্ক্ষিত ছিলো।

কলকাতা হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। এবার তিনি এলেন ব্রিটিশ বিমান যোগে। রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, কূটনীতিকবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে স্বাগত জানান। বিমানবন্দরে ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু। তারপর দ্রুত স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বিজয়ী মহানায়ক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ছাড়াও ওই বিমানে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া সপরিবারে ড. কামাল হোসেন, সাংবাদিক আতাউস সামাদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রাচার প্রধান ফারুক চৌধুরী। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বিজয়ী মহানায়ক স্বদেশে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি আবেগের পাশাপাশি সিহালা অতিথিশালায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যেসব কথা হয়েছিলো সেই কথারও জবাব দেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও ঘৃণার ভাব পোষণ করি না। তোমাদের স্বাধীনতা তোমাদের রইল। আমাদেরকে স্বাধীনতায় থাকতে দাও'।

আঁধার কাটিয়ে যিনি রক্তের আভায় নতুন ভোরের আলোতে মানুষকে উজ্জীবিত করার প্রেরণা জাগাতে পারেন, তিনিই হয়ে ওঠেন ইতিহাসের মহানায়ক। বাঙালি জাতিকে স্বপ্নের স্বাধীনতার উদ্দীপ্ত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বপ্ন বাস্তবায়নের পর ফিরে আসা মৃত্যুঞ্জয়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন বাংলার আপামর জনগণ। অনাবিল প্রাণের সেই উচ্ছ্বাস মহানায়কের জীবনে পরিতৃপ্তির বাসনার প্রকাশ।

লেখক : সাংবাদিক, প্রধান প্রতিবেদক, দৈনিক যুগান্তর

শীতের দিনগুলোতে

নভেরা হোসেন

পথে ধুলা, জানালার পর্দা খুললে জ্বলজ্বলে রোদ
রাতগুলো হালকা ঠাণ্ডা
গায়ে জড়িয়ে নিয়েছো কালো শাল, পা মোজা
একটু ঠাণ্ডা হাওয়া তোমার চোখে-মুখে মৃদু পরশ বোলালো
সেই থেকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস
এটা খাও, সেটা খাও
গরম জল, আদা চা, লেবু চা
মধু, লবঙ্গ, দারুচিনি
এরপর শুরু হলো এন্টিবায়োটিক
একবার ভুল ওষুধ, আরেকবার
তাতেও কিছু হলো না
ঠাণ্ডা ক্রমেই বাড়তে লাগল
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আস্ত একটা হাসপাতাল
এরপর বড় হাসপাতালের বড় ডাক্তার
নতুন করে এন্টিবায়োটিক আরও অনেক ওষুধ
একটু একটু করে ঠাণ্ডা কমছে
শীতও কমে এলো
জানালায় কাঁথা টানানোর দিন শেষ হয়ে এলো
জঙ্গিদের নারী স্কোয়াড পেটে বোমা বেঁধে সব আত্মাহুতি দিচ্ছে
প্রকাশকরা বইয়ের প্রচ্ছদ ছাপা নিয়ে ব্যস্ত
সবকিছুই চলছে ঘড়ির কাঁটায়
পৃথিবী দৌড়াচ্ছে
আলেপ্পো থেকে শরণার্থীরা সরে যাচ্ছে
শীতে বসছে নানা গানের উৎসব
লোকজন পিকনিকে যাচ্ছে
গ্রামে যাচ্ছে, আউটিংয়ে যাচ্ছে
ইতালি, ফ্রান্স, মিশর
এমনকি শোনা যাচ্ছে পাতালেও টুরিস্ট স্পট তৈরি হচ্ছে
চাঁদ বা মঙ্গলেও হতে পারে অবকাশযাপন
দিন দিন ভোগী হয়ে উঠছো
চারপাশের সবকিছুকে গলধঃকরণ করে নিচ্ছো
একটা কোমল তৃণও খাদ্য তালিকা হতে বাদ পড়ছে না
সর্বভূক তেলাপোকা তোমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে
তোমার ঘরে হরিণের শিং শোভা পায়
আর বিস্তর লিখে চলেছো গ্রীন-হাউজ নিয়ে

তোমার মধ্যে একজন পতঙ্গভুক
তোমার মধ্যে একজন তৃণভুক
প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছো
আর আকাশে অসংখ্য তারা ডানা মেলতে শুরু করেছে

শীত আসবে বলেই

রফিকুল ইসলাম

শীত আসবে বলেই
পৌষের শীতার্দ্র দাপটে পথের মতো
তোমার পায়ের চিহ্ন আঁকে,
হিমেল হাওয়ায় হলুদ পাতার মতো
ঘরে ফেরে পাখি বিষণ্নতা মেখে।

শীত আসবে বলেই
ইচ্ছেগুলো শীতের সকালের মতো
উষ্ণতা হারায় কুয়াশার আবরণে,
আমার বিষাদগুলো লাল সূর্যের মতো
ক্লান্তিতে ডুবে সন্ধ্যার উদাসী রণনে।

শীত আসবে বলেই
ও চোখের কাজল, রাত্রি জাগে হিমঘরে
কেঁদে ঝরে সবুজ পাতার পরে,
শুকিয়ে গেছে চুম্বন ঠোঁট, গোধূলির প্রেম
উত্তরের রুক্ষ হাওয়া ফিরে।

শীত আসবে বলেই
ফেরারী সুখগুলো নরম বিড়ালের মতো
বরফ-রাত্রি ওম খোঁজে লেপের ভাঁজে,
শৈত্য হিমরাতে জেগে থাকে পুকুরের জল
ঘাসের শিশির, রোদ্দুরের খোঁজে।

ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, শুভ বড়দিন

ম্যানুয়েল সরকার

যিশু খ্রিস্ট যিহূদিয়া প্রদেশের বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করে মা মারিয়ার কোল আলোকিত করেছিলেন।

পঁচিশে ডিসেম্বর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই বিশেষ দিনটি বিশ্বব্যাপী প্রার্থনাপূর্ণভাবে এবং অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করেন। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন এই বড়দিনে অনেক আনন্দ ও উচ্ছাসের প্রতিফলন হয়। খ্রিস্টিয় জীবনে বড়দিনের ব্যাপ্তি অনেক। বড়দিনের চার সপ্তাহ আগে থেকে আগমন কালের মধ্য দিয়ে গীর্জায় গীর্জায় বড়দিনের প্রস্তুতি শুরু হয়। বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সবাইকে প্রস্তুত হতে হয় এই খ্রীস্টিয় সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানটির জন্যে। যিশু খ্রিস্টের জন্মকে স্মরণ করার জন্য বড়দিন উদযাপন করা হয়, যাকে খ্রিস্টভক্তরা ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করেন। 'ক্রিসমাস' নামটি এসেছে মাস অফ ক্রাইস্ট বা যিশু থেকে। বড়দিনে মানুষেরা অন্যদের কাছে 'মেরি ক্রিসমাস' বলে আশা প্রকাশ করেন যেন তারা সুখে থাকেন, ভাল থাকেন। ক্রিসমাসের কারণে, আমরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হয়ে উঠি, এই জীবনে প্রভুকে জানার, ভালবাসা এবং সেবা করার এবং পরের জীবনে চিরকাল তাঁর সাথে সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই বিশেষ দিনটি সাগ্রহে পালন করা হয়।

ঐতিহ্য অনুসারে, বড়দিনের আগে চতুর্থ রবিবারে ক্রিসমাস ট্রি এবং সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে বড়দিনের আয়োজন শুরু হয়। সাধারণত নভেম্বরের শেষের দিকে বা ডিসেম্বরের শুরুতে সমস্ত শহর জুড়ে আলোকময় সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে বড়দিনের আগমনী বার্তা পৌঁছে যায় সবার কাছে। বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, মার্কেট, গীর্জাসহ সব জায়গায় বড়দিনের ছোঁয়া লাগে।

বিভিন্ন দেশে থ্যাঙ্কস গিভিং ডের (বিভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়ে পালিত হয়) পরে মূলত ব্ল্যাক ফ্রাইডে থেকে বড়দিনের কেনাকাটা শুরু হয়। এসময়ে বিভিন্ন পণ্যে বিশাল ছাড় দেয়া হয়। খুব স্বল্পমূল্যে কেনাকাটার জন্য মানুষ মধ্যরাত থেকে লাইনে দাঁড়ান। ঐতিহ্যগতভাবে এসময় বিভিন্ন দেশে ক্রিসমাস কেনাকাটার মরসুম শুরু হয়। সকলে এই দিনটিকেই বছরের ব্যস্ততম কেনাকাটার দিন হিসাবে গন্য করেন।

যিশু খ্রিস্ট শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তাই বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতায় শিশুদের অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। বড়দিনের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই তাদের ব্যাপক আগ্রহ নিশ্চিত করা হয়। শিশুরা তাদের পছন্দ অনুসারে সব আয়োজনে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। বড়রা তাদের সাথে থেকে উৎসাহ দেন। শিশুরা নিজ হাতে ক্রিসমাস কার্ড তৈরি করে এবং সেগুলো ডেকোরেট করে শুভেচ্ছা বার্তাসহ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে বিনিময় করে।

ক্রিসমাস ট্রি বড়দিনের আরেক অনুষঙ্গ। বাড়ির বড়দের সাথে শিশুরাও অনেক আগ্রহের সাথে ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সাজাবার সামগ্রী তারা, বল, লাইট, গিফটসহ অনেক কিছু দিয়ে এটিকে দারুণ ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। প্রভুর আগমন পৃথিবীতে আমাদের পথ দেখিয়েছে এবং তাঁর দীপ্তির সৌন্দর্য আমাদের আনন্দ এবং বিস্ময়ে মুগ্ধ করে, যা ভালবাসা ও অনুগ্রহের আধ্যাত্মিক উপহার। এই ক্রিসমাস ট্রি আনন্দের একটি ক্ষীণ পূর্বাভাস।

ক্রিসমাস ক্যারল, ক্রিসমাসের এক অনিবার্য অংশ। অনেক দিনের প্রস্তুতির পর ক্রিসমাস ক্যারল উপস্থাপন করা হয়। শিশু থেকে বয়স্ক সবাই মিলে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে নেচে গেয়ে বড়দিনের আনন্দ ভাগা-ভাগি করে নেয়ার একটা দারুণ সুযোগ তৈরি করে দেয় এই ক্রিসমাস ক্যারল। বড়দিনে গীর্জায় ক্রিসমাস ক্যারল এক বিশেষ ভাল লাগার অংশ। সবাই মিলে অনেক উদ্যোগ ও আগ্রহের মধ্য দিয়ে ক্রিসমাস ক্যারলের সঙ্গী হয়। ক্রিসমাস ক্যারল বড়দিনে এক অন্য মাত্রা যোগ করে।

সান্তা ক্লজ বড়দিনে বাড়তি আনন্দ এনে দেয়। শিশুরা অপেক্ষায় থাকে কখন আসবে সান্তা ক্লজ তাদের জন্য উপহারের ঝুলি নিয়ে। গভীর রাতে সান্তাক্লজ শিশুদের জন্য বিভিন্ন উপহার সামগ্রী রেখে দেয়। ঘুম থেকে উঠে উপহার পেয়ে শিশুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। বড়দিনে সান্তা ক্লজ মূলত সবার আনন্দ নিশ্চিত করে।

বড়দিনে তারার অবস্থান অনবদ্য। ক্রিসমাসের তারা বেথলেহেমের নক্ষত্রের প্রতীক, যা বাইবেল অনুসারে, তিন রাজা বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে শিশু যিশুর দিকে পরিচালিত করেছিল। নক্ষত্রটি অনেক আগে পূর্ণ হওয়া একটি ভবিষ্যদ্বাণীর স্বর্গীয় চিহ্ন এবং মানবতার জন্য উজ্জ্বল আশা হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্ষমতা, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাফল্য অস্থায়ী বাহুবল হতে পারে যা শূন্যতার মুখোমুখি একটি অস্থির আত্মাকে শান্ত করে, তবে এর সমস্ত কিছু, সমস্ত প্রচেষ্টা, কষ্ট, চাওয়া, আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হওয়া, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি শেষ পর্যন্ত কিছুই বোঝায়না যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস ছাড়া।

ক্রিসমাস ক্রিব বা বড়দিনের গোশালা, যিশু খ্রিস্টের জন্মকে স্মরণ করে বাড়িতে বাড়িতে তৈরি করা হয় এই গোশালা ঘর। এটিতে যিশু খ্রিস্টের জন্মের দৃশ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গোশালা এমন চিত্র প্রদর্শন করে যা শিশু যিশু, মা মেরি এবং বাবা জোসেফকে প্রতিনিধিত্ব করে। গোশালার যাব-পাত্রেই শিশু যিশুকে জন্মের পরে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। এই গোশালাঘর খ্রিস্টিয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ক্রিসমাস ব্যরেথ বা ক্রিসমাসের জয়মাল্য, বড়দিনে সামনের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয় যা অতিথিদের স্বাগত জানানো এবং মুগ্ধ

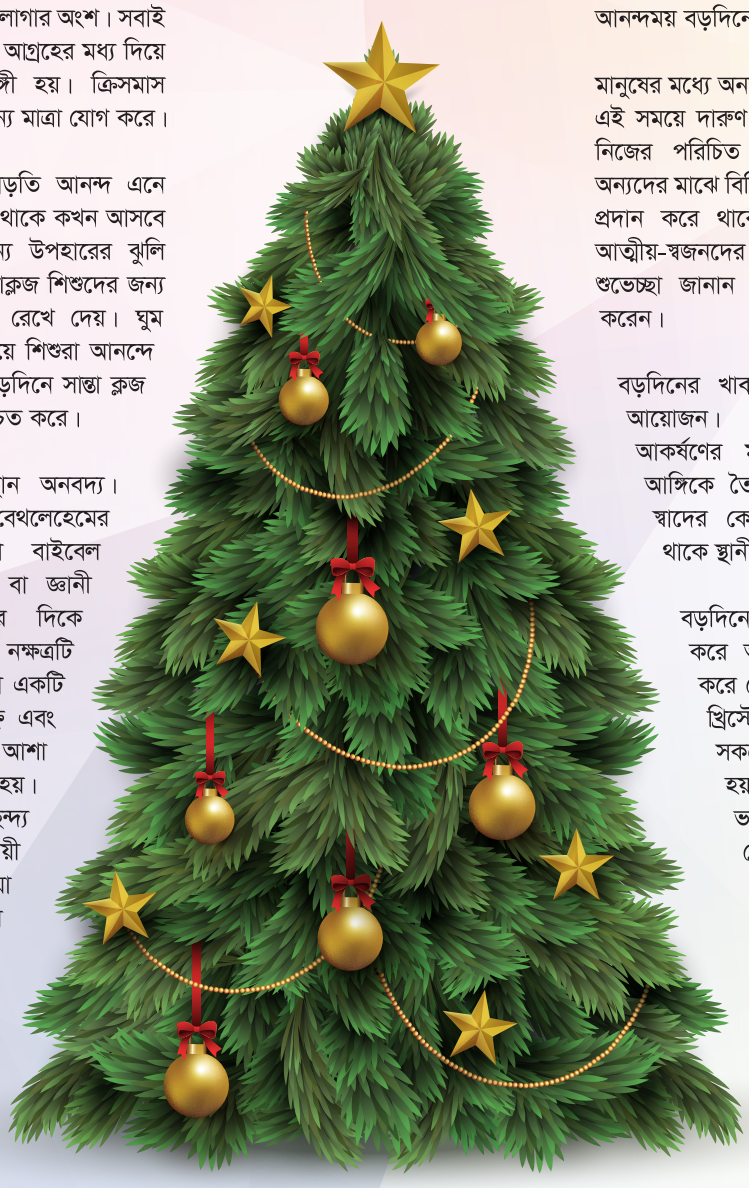

করার একটি দুর্দান্ত উপায়। একসাথে, বৃত্তাকার আকৃতি এবং চিরহরিৎ উপাদানের পুষ্পস্তবক অনন্ত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বও করে, খ্রিস্টানরা প্রায়শই আবির্ভাবের সময় পুষ্পস্তবকের উপর একটি মোমবাতি স্থাপন করে। যিশু পৃথিবীতে যে আলো এনেছিলেন তার প্রতীক হিসাবে এটি মান্য করেন।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্য ভাব বিনিময়ের একটা দারুণ সময় এই বড়দিন। পরিবারের বয়স্ক মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া এবং তাদের সাথে কাটানো সময় পারিবারিক জীবনে অনেক আনন্দের, অনেক প্রশান্তির। পরিবারের শিশুরা তাদের সান্নিধ্য অনেক উপভোগ করে। দারুণ খুনসুটিতে কাটে তাদের আনন্দময় বড়দিনের দিনগুলি।

মানুষের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত উপহার বিনিময় এই সময়ে দারুণ উপভোগ্য বিষয়। সবাই নিজের পরিচিত মানুষের মধ্যে ছাড়াও অন্যদের মাঝে বিভিন্ন দান ও উপহার সামগ্রী প্রদান করে থাকেন। বড়দিনে মানুষেরা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করেন, শুভেচ্ছা জানান এবং আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

বড়দিনের খাবারের জন্য হয় ব্যাপক আয়োজন। ক্রিসমাস কেক হ'ল আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি করা হয় ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কেক। কেকের পাশাপাশি থাকে স্থানীয় খাবারের নানা পদও।

বড়দিনে খ্রিস্টিয় মূল্যবোধ ধারণ করে আগামী বছরটাকে সুন্দর করে তোলার প্রত্যয়। ত্রাণকর্তা খ্রিস্টের শিক্ষায় পৃথিবীর সকলের জন্য শুভকামনা করা হয়। সবাই যেন সুস্থ থাকে, ভাল থাকে ও মানবিক হয় সেই আহ্বান জানানো হয়। বড়দিনের আকাঙ্ক্ষা এভাবেই পুনর্ব্যক্ত হয়-আনন্দ, সুখানুভূতি এবং ভালবাসা ছড়িয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে।

লেখক: শিক্ষক
এস,এফ,এক্স, গ্রীণহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

১০ জানুয়ারি, তিনি এলেন

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

১০ জানুয়ারি
তিনি যখন বিমানের সিঁড়িতে
ধীরে নামছেন মহাসমুদ্রের জোয়ারে
রচিত হচ্ছে তখন
আনন্দ বেদনারন এক মহাকাব্য।

তিনি এলেন। মেঘের থেকে মুখ তুলে দেখলেন
ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দের পাখি এসে নামছে
জনস্রোতে।
তাঁর ভেতরেও কি এক পাখি ঝাপটাচ্ছে,
চোখে অশ্রু, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ
তবুও দীর্ঘ কারাবাসের পর
মলিন সেই মুখে হিরন্ময় জ্যোতি।

তিনি এলেন, দেখলেন,
জলের ফোটায় লেখা আছে রক্তিম স্বাধীনতা
স্বজন হারানোর বেদনা, ধ্বংসস্তূপের ভেতরেও
ফুটে আছে রক্তকুসুম জবা।

তিনি এলেন, অগ্নিবীনা নিঃসৃতকণ্ঠে যখন বললেন
জয় বাংলা....
যেনো দূর বনচ্ছায়া থেকেও শোনা যাচ্ছে বাঘের গর্জন।

মেঘের খামে আসেনি চিঠি

মমতা মজুমদার

কতকাল আমি ঘুমিয়ে আছি,
হেমন্তের ওই সোনা ঝরা মাঠে।
শিশিরের জলে আধশোয়া হয়ে, ঘুমন্ত
পাপিয়ার সাথে।
দখিন জানালা খুলে হলুদ সর্ষে ফুলের ঘ্রাণ
আসেনি কখনো আমার ঘরে;
মেঘের খামে আসেনি তো চিঠি ভুল করে
আমার নামে।
দিগন্ত ছুঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি জানিনা ঠিক কবে,
মনে পড়ে না এখন আর শীতের আগমনী গানে!

হিম শীতল বাতাসে কুয়াশার চাদর গায়ে মুড়িয়ে
ছিলাম গভীর ঘুমে;
যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে খেলেছি কেবল আপন মনে!
কেউ জাগিয়ে তুলেনি বহুদিন, বহুকাল এই
প্রিয় নামটি ধরে।
আমাকে নেশা ধরেছে এক পল্লী গাঁয়ের মাঠে;
যেথায় ছিল আমার ভিটেমাটি, মা, মাটি আর ভালোবাসার টানে।
পাল তোলা নৌকা দেখিনি কখনো জন্মের পরে।
শুনেছি কেবল ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি মধুর গান
ছিল এই লোকালয়ে।

আমাকে জাগতে হবে, সূর্যের কিরণ ছড়ানো
এক ভোরের আগমনের সুর শুনে।
পাখির সাথে, ফুলের গন্ধ নেব হেঁটে হেঁটে
ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে।
রাখালের বাঁশির সুর কেউ শুনে না এখন আর
বটতলার মাঠে।
শৈশব থেকে শুনেছি কেবল আমার মায়ের মুখে।
শীতের আগমনে চুপসে গেল, চেনা পথ অচেনা বাটে।
এবার জেগে ওঠে দেখবো আমার পল্লী গাঁয়ের
মেঠো পথ হেঁটে।

জন্মদ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মোহাম্মদ আজম

১৮৫৯ সালে শর্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত হওয়ার পরই বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) অন্তত তখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসাবে প্রাথমিক স্বীকৃতিলাভ করেন। অবশ্য কোনো পাঠকের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যদি থেকেও থাকে, তা দূর হওয়ার জন্য তিনি খুব বেশি সময় নেননি। তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ রচনাবলির প্রায় সবই – শুধু চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) বাদে – প্রকাশিত হয়েছিল তিন বছরের মধ্যে। ১৮৫৯-এ শুরু হয়ে ১৮৬২ সালেই শেষ। কাজেই তখনকার ক্ষুদ্র পাঠকশ্রেণির পক্ষে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসাবে মধুসূদনকে সাব্যস্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

তখন পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে কলকাতায় এক নতুন যুগ সূচিত হয়েছিল। জীবন সম্পর্কে অন্তত কিছু মানুষের, বিশেষত পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে পরিচিত মানুষজনের, ভাবধারা ভীষণভাবে বদলে গিয়েছিল। মধুসূদনের রচনায় তাঁরা সে পরিবর্তিত ভাবধারার মানানসই প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। ভাবের মতো প্রকাশভঙ্গির দিক থেকেও মধুসূদন রচনাবলিতে এমন নতুনত্ব প্রকাশিত হয়েছিল, বাঙালি পাঠক যার তুল্য কিছু আগে কখনো ভাবেনি। তাই ওই রচনার ভাবগত আধুনিকতায় পূর্ণরূপে অবগাহন করতে না পারলেও রচনাগুলো যে অভাবনীয় মাত্রায় নতুন, এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না।

তবে মূল্যায়নের এ ধরন বেশিদিন বজায় থাকেনি। তাঁর জীবনকালেই, অর্থাৎ ১৮৭৩-এর আগেই, মধুসূদন-পাঠের এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। উনিশ শতকের শেষদিকে কলকাতার বাঙালি সমাজে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ভাবধারা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ওই আবহে মধুসূদন অনেক বেশি অচেনা গণ্য হয়েছিলেন। তাঁকে ব্যাপকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল হিন্দু সমাজের ও ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ধারণাগুলো বিকৃত করার অভিযোগে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এ অভিযোগ তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাটিকে ওই কালের মধুসূদন-পাঠের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলা চলে।

বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। একাধিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর আগের মূল্যায়ন থেকে সরে

আসেন, এবং মধুসূদনের রচনার মূল্য ও মহিমা নতুনভাবে সাব্যস্ত করেন। পরে মোহিতলাল মজুমদার শ্রীমধুসূদন নামের ক্লাসিক সমালোচনা-গ্রন্থে মেঘনাদবধ কাব্যের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের চিরস্থায়ী কীর্তির পরিচয় নির্মাণ করেন। আরো পরে মধুসূদনকে দেখা হতে থাকে প্রধানত বাংলার উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সবচেয়ে কীর্তিমান ও সার্থক প্রতিনিধি হিসাবে। বিশ শতকের ষাটের দশকে প্রকাশিত ক্ষেত্রগুপ্তের মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প বইকে বলতে পারি এ দৃষ্টিভঙ্গির উত্তম প্রকাশ। গোলাম মুরশিদ অনেক পরে আশার ছলনে ভুলি নামের গ্রন্থে মধুসূদনের যে অসামান্য জীবনী রচনা করেছেন, তাও এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রচিত। প্রশ্ন হল, কোন গুণে গুণী হওয়ার কারণে এত দীর্ঘ সময় ধরে বড় ধরনের গুরুত্ব প্রদর্শনপূর্বক মধুসূদন রচনাবলি পঠিত হচ্ছে; আর কেনই বা বিভিন্ন যুগে তাঁর মূল্যায়নে এত বড় ধরনের পালাবদল ঘটেছে। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোনো মূল্যায়নের জন্যও আমাদের আসলে ফিরে যেতে হবে উনিশ শতকে কলকাতায় সংঘটিত নবজাগরণের কাহিনিতে।

উনিশ শতকে সংঘটিত কলকাতার নবজাগরণ সম্পর্কে আজকাল বেশিরভাগ বিদ্যাজীবী খুবই সমালোচনামুখর। একে আসলেই নবজাগরণ বা রেনেসাঁ বলা যায় কি না, বহু মানুষ সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ওই জাগরণের নানা অনপনেয় সীমাবদ্ধতা নিয়েও বহু সন্দর্ভ রচিত হয়েছে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নাই, উনিশ শতকের অন্তত কলকাতা-নিবাসী বাঙালি-জীবনে বড় ধরনের রদবদল ঘটেছিল। তার কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। ইংরেজ শাসন তখন এদেশে জেঁকে বসেছে। আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ঘটেছে। আর এর সূত্র ধরে কলকাতার এবং আশপাশের এলাকার অন্তত নতুন প্রজন্মের সামনে ইউরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনধারা নতুন কিছুর বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছিল। সমস্ত বাঙালির জীবনে নয়, কিন্তু কলকাতার ওই সক্ষম জনগোষ্ঠীর জীবনে এর ফলে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার তুলনা এ অঞ্চলে আগে কখনো দেখা যায়নি।

পশ্চিমা প্রভাবের একটা প্রধান দিক ছিল লিবারেল তথা উদার-মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। কলকাতার অপ্রস্তুত জমিনে ওই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই যথাবিহিত প্রকারে বিকশিত হয়নি। কিন্তু উদারনীতিবাদী ইউরোপীয় ভাবুকদের বইপত্র পড়া এবং খুব সীমিত পরিসরে হলেও তার চর্চা যে কলকাতায় হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কলকাতায় তার এক ধরনের প্রকাশ ঘটেছিল রামমোহন রায়ের লেখালেখি ও কাজে। অন্য ধরনের প্রকাশ দেখতে পাই কথিত ইয়ং বেঙ্গলদের তৎপরতায়। শেষোক্তদের কাজে যে এক ধরনের বিদ্রোহী মনোভাবের বিকাশ ঘটেছিল, তাও ইতিহাসে স্বীকৃত। অনেকেই তখন সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন। পুরাতন সমাজ ও সংস্কৃতির সমালোচনা খুব প্রবলভাবে কারো কারো কাজে প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষিত নাগরিক সমাজের তুলনামূলক পিছিয়ে-থাকা অংশ হিসাবে নারীদের নিয়েও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ-আয়োজন চলেছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেড়ে উঠেছিলেন এ আবহের মধ্যে। তিনি নিজে ইয়ং বেঙ্গল বলে কথিত দলটির অনেকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আর ভাবে-স্বভাবেও তাঁর সাথে এ দলের বিশেষ সখ্য ছিল। তাঁর রচনাবলিতে এর পরিষ্কার ছায়া পড়েছে। আসলে কেবল ছায়া নয়, বলা উচিত, মধুসূদনের রচনাতেই এ কালের অন্তর্নিহিত গতি ও প্রগতি আদর্শ ও উত্তুঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রত্যক্ষত সমকালীনতার প্রভাব মধুসূদনের রচনার প্রধান দিক নয়। একেবারে সমকালীন বিষয়াদি, সেকালের অন্য অনেকের মতো, তাঁর রচনায় এসেছে প্রধানত হাস্যরসের ভঙ্গিতে। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত দুটি প্রহসনে সমকালকে তিনি তীর্যক সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বরণ করেছিলেন। এর মধ্যে একেই কি বলে সভ্যতা? একদিক থেকে আত্ম-সমালোচনার মতো। এ প্রহসনে তিনি কলকাতার নব্য-শিক্ষিত সমাজের সমালোচনা করেছেন। তাদের বাহ্যিক আড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতার তীব্র প্রতিবেদন রচনা করেছেন হাস্যরসিকতা আর ব্যঙ্গের আমেজে। তিনি নিজেও যেহেতু এ দলেরই একজন, আর চর্চার গভীরতার দিক বাদ দিলে অন্য আচার-আচরণের দিক থেকে ওই যুবাদের সাথে তাঁর মিল যেহেতু প্রায় আক্ষরিক, সেহেতু একে এক প্রকার আত্মসমালোচনা বলা যায়।

তবে তিনি এর বিপরীত সমাজকে মোটেই উৎসাহিত করেননি। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ নামের অপর প্রহসনে প্রাচীনপন্থি রক্ষণশীল সমাজের ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। সমালোচকদের মতে, শেষোক্তটি প্রথমটির চেয়ে প্রহসন হিসাবে উত্তম। সে কথা সত্য। কারণ, সুগঠিত কাহিনী ও চরিত্রায়ণের বিচারে বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ নিঃসন্দেহে উত্তম রচনা। তবে এ কথাও সত্য, এ প্রহসনে সমকালীন 'রক্ষণশীল' অংশটির মনোজগতের সমালোচনার বদলে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির এক বিশেষ স্বভাবের সমালোচনা করা হয়েছে। তুলনায় একেই কি বলে সভ্যতা? প্রহসনে নব্যপন্থিদের আচরণগত সংকটের পাশাপাশি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটেরও নিগূঢ় পরিচয় মেলে।

যাই হোক, এ প্রহসন দুটিতে মধুসূদন সমকালকে যেভাবে মোকাবেলা করেছেন, অন্য রচনাগুলোতে মোটের উপর সেভাবে করেননি। তাঁর অন্য নাটকগুলো, যেমন শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), প্রধানত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনিকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনি বা বহিঃস্তরে অতীতের আবহ থাকলেও চরিত্রায়ণ কিংবা অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবাহের দিক থেকে এগুলো সমকালীন স্বভাবেরই মূর্তরূপ। বস্তুত, নাটকে মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব পশ্চিমা নাটকের আঙ্গিক ও মঞ্চায়ন-পদ্ধতিকে প্রথমবারের মতো সার্থকভাবে রূপায়িত করা। এদিক থেকে কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিশেষ মূল্য আছে। এ নাটকেই পশ্চিমা রীতির ট্র্যাজেডি প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে

প্রকাশিত হয়েছে বলে সমালোচকদের মধ্যে মতৈক্য আছে।

কাব্যের দিক থেকেও পৌরাণিক-প্রাধান্যের ব্যাপারটিই মধুসূদনে প্রধান। কিছু সনেট এবং কিছু নীতিমূলক বা শিশুতোষ কবিতা বাদ দিলে মধুসূদনের প্রধান কবিকৃতি মুখ্যত পুরাণ-নির্ভর। কিন্তু ওই পৌরাণিক আবহের মধ্যেই নতুন কালের নতুন ভাবপ্রবাহের এমনসব রূপান্তর তিনি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, তাঁকে ওইকালের শ্রেষ্ঠ মনীষা হিসাবে সাব্যস্ত করতে একবিন্দুও ভুল হয় না।

মেঘনাদবধ কাব্যের (১৮৬১) কথাই ধরা যাক। মধুসূদনের এ প্রধান কীর্তিটি বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক মহাকাব্য হিসাবে, বেশ অনেকদিন হল, সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। প্রশ্ন হল, কীভাবে এটা সম্ভবপর হল। কেনই বা এত এত প্রচেষ্টার মধ্যে কেবল তাঁর রচনাটিই সার্থকতার শিরোপা পেল। এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, মহাকাব্য রচনার জন্য কেবল প্রস্তুতি বা আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়। উপযুক্ত কবিত্ব ও প্রস্তুতির সাথে কালের আনুকূল্যও দরকার হয়। কলকাতার নতুন ভাব-স্বভাব, তৎপরতা এবং নতুন কালের নতুন মানুষদের আবহের মধ্যে মধুসূদনের পক্ষেই কেবল সে ধরনের উদ্যম ও উচ্চাভিলাষ সম্ভব ছিল, যা না থাকলে কোনো রচনা মহাকাব্যের মহিমায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

মধুসূদনের রাবণ তুরীয় মহিমায় বিকশিত এক চরিত্র। লঙ্কার রাজসিংহাসনে আসীন রাবণকে পুত্রশোকে কাতর হয়ে যখন বিলাপরত দেখতে পাই, তখন বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হিসাবে এক ট্র্যাজিক চরিত্রকেই আমরা দেখি। রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠে রাবণ যখন যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি অবলোকন করে, কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করে সমুদ্রের সমালোচনা করে, তখন আমরা একজন দায়িত্বশীল নৃপতি আর নীতি-নৈতিকতার গভীরতর বোধে জারিত একজন মানুষকে দেখতে পাই। অন্যায়-সমরে দিগ্বিজয়ী পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর পরে দেখি রণনিপুণ আর সাহসিকতায় উজ্জ্বল এক বীরকে। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, তার সবই করেছিল রাবণ। মানুষের অন্তর্নিহিত ও আচারণগত যাবতীয় মহিমায় বিকশিত হয়েছিল রাবণের দশদিক। কিন্তু যেখানে বিধি বাম, যেখানে আড়ালে থেকে রচিত হয় মানুষের ভাগ্য, সেখানে মানুষ নিপতিত হয় ট্র্যাজিক পরিণতিতে। রাবণের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। অসীম শক্তিমত্তা আর যাবতীয় গুণে গুণান্বিত এক মানুষের মহাপতন রচনায় অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন মধুসূদন। আর এভাবেই তাঁর নায়ক হয়েছে মহাকাব্যের নায়ক।

মেঘনাদবধ কাব্যকে পরাধীন বাংলার রূপক-প্রকাশ হিসাবে দেখার রেওয়াজ আছে। ঐশ্বর্যমণ্ডিত লঙ্কাপুরীকে স্বদেশের কল্পিত মূর্তি হিসাবে পাঠ করারও বিস্তর প্রেরণা এ মহাকাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কালের বিচারে এ দুই ভাবনা পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার লক্ষণ মধুসূদনের কালে ছিল না। বরং যদি এ চরিত্রকে এবং সামগ্রিকভাবে কাব্যটিকে উদারনৈতিক মানস-স্ফূর্তির প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়, যার ইশারা আমরা আগেই দিয়েছি, তাহলে ব্যক্তির পরম বিকাশের এক মনোহর রূপ হিসাবে একে পাঠ করা যায়।

বৃহত্তর সমাজে খুব নগণ্য প্রভাব বিস্তার করলেও উনিশ শতকের পশ্চিমা প্রভাব প্রচণ্ড নতুনত্ব নিয়ে যে আবির্ভূত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। লর্ড বেন্টিংকের শাসনামল থেকে ইঙ্গবাদী তথা অ্যাংলিসিস্টদের ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে শাসকদের পক্ষ থেকে পশ্চিমায়নের পক্ষে নানা তৎপরতা শুরু হয়েছিল। সমাজের তুলনামূলক ছোট অংশে তার নানামাত্রিক প্রভাবও পড়েছিল। ধর্মের দিক থেকে ব্রাহ্মধর্মের পরিচর্যা, সমাজ-সংস্কারের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা, শিক্ষায় পশ্চিমা ধারার প্রচলন ও ইংরেজি আবশ্যিক ভাষা হিসাবে ঘোষিত হওয়া – ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজে ব্যক্তির বিকাশের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, মধুসূদনের কাব্যে দেখা যায় তার সর্বোত্তম প্রকাশ। কিন্তু পরাধীন দেশে সে প্রকাশ ও বিকাশ তো ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। কাজেই রাবণকে নিয়ে বীররসের কাব্য লেখার পরিকল্পনা যে শেষতক করুণরসে পর্যবসিত হবে, আর লঙ্কার এক ধরনের পতন ঘটবে, তা তো অবশ্যম্ভাবী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে এভাবেই খুব নিগূঢ় অর্থে একটা কালের ভাব ও স্বভাব কাব্যাঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষাংশে এ ভাব-স্বভাবের আমূল পরিবর্তনের কারণে নতুন কোনো সার্থক মহাকাব্য তো তৈরি হয়ইনি, এমনকি মধুসূদনের কাব্যটি পড়ার মতো মানসিক প্রস্তুতিতেও টান পড়েছিল। সে কারণেই তখন অনেকে, যেমন বালক রবীন্দ্রনাথ, এর নিন্দা করেছিলেন।

মহাকাব্য রচনায় মধুসূদনের প্রস্তুতিও হয়েছিল অসাধারণ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁকে দিয়েছিল বন্ধনমুক্তির স্বাধীনতা। ভাষার স্বাভাবিক ওজঃগুণ, যা মহাকাব্য রচনার জন্য অতি-আবশ্যক, তা তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন সেকালের বাংলাচর্চার প্রধান প্রবণতা থেকে। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই সংস্কৃত ভাষার দেদার ঋণের মধ্য দিয়ে যে নতুন গদ্যের চর্চা চলছিল, তার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে, বলা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনায়, বিশেষত মেঘনাদবধ কাব্যে। আর ভাব-ভাষা-ছন্দ ও প্রকল্পনার দিক থেকে পশ্চিমা ক্লাসিক সাহিত্য থেকে যতটা নেয়া সম্ভব, মধুসূদন তা নিতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত উৎসের ব্যাপারে প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা ছিল; কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার করলে বোঝা যায়, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাঁর ছিল।

সার্বিকভাবে মধুসূদন-রচনাবলির অন্যতম প্রধান শ্রেষ্ঠত্ব তার আধুনিকতায়। মানবকেন্দ্রিকতা ও ইহলৌকিকতা ওই আধুনিকতার অন্যতম দুই স্তম্ভ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই নতুনভাবে চারপাশকে এবং জীবনযাপনকে দেখতে প্ররোচিত করে। সমাজে তার সম্যক বিকাশ না ঘটলেও প্রতিভাবান সৃষ্টিশীলের রচনায় অগ্রসর প্রতিমূর্তি প্রণীত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, দুনিয়ার কোনো এক প্রান্তে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা অর্জিত হলে, তা স্বভাবতই সমগ্র মানব-সমাজের অভিজ্ঞতা হিসাবে গণ্য হয়ে অন্য মানুষদেরকেও নানা মাত্রায় প্রভাবিত করে যায়। মধুসূদন যে

ভাবের দিক থেকে পশ্চিমা আধুনিকতাকে বেশ অনেকদূর পর্যন্ত এস্তেমাল করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণপত্র মেলে সাহিত্যকর্মে। বীরাঙ্গনা কাব্যকে (১৮৬২) এ দিক থেকে পাঠ করাই সঙ্গত।

বাংলা সাহিত্যে বীরাঙ্গনা কাব্যের জুড়ি আগে তো ছিলই না, আসলে পরেও খুব সামান্যই পাওয়া যাবে। পত্রকাব্য হিসাবে এর ফর্মের একটা নতুনত্ব ও বিশেষত্ব তো আছেই। পুরনো কাহিনিকে নতুনভাবে পাঠ করা এবং কাব্যে রূপায়িত করা, আর অনেকগুলো স্মরণীয় চরিত্র রচনার কৃতিত্বও এ কাব্যের কবি পাবেন। কিন্তু আমরা এখানে বিশেষভাবে জোর দিতে চাই কাব্যটির নারীমূলকতার উপর। এ কাব্যে মধুসূদন বিস্ময়কর কুশলতায় নারী-ভাষ্যের কাব্যরূপ প্রণয়ন করেছেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলো সামাজিক সংস্কারের বশে যেভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার আগল ভেঙে মধুসূদন তাদের মুক্তি দিয়েছেন। এ কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো কাব্যিক কৃতিত্ব। প্রথমত, মুক্তির কাহিনী তিনি লিখেছেন অমিত্রাক্ষরের মুক্ত প্রবাহে, অনেক সমালোচক যে অমিত্রাক্ষরকে এমনকি মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দের চেয়েও অনেক পরিণত মনে করেন। দ্বিতীয়ত, কাহিনী বর্ণনা করা এবং তাতে কাব্যিকতা প্রতিষ্ঠা করার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে এ কাব্যের কোনো কোনো পত্রে। সাথে যুক্ত হয়েছে মধুসূদনের বিখ্যাত নাটকীয়তা। তৃতীয়ত, পৌরাণিক চরিত্রের আবহ অক্ষত রেখে পত্রগুলো যে কেবল নতুন যুগের নারী তৈরি করেছে তা নয়, নারীদের নারীমূলকতাও ভাষায় প্রতিষ্ঠা করার জোর সাফল্য অর্জন করেছে। সামগ্রিকভাবে বীরাঙ্গনা কাব্য নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার বড় অভিজ্ঞতা।

মধুসূদনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্লাসিক প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর সনেটগুচ্ছেও। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) আজতক বাংলা সনেট-কবিতার আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান আছে। ভাবে, ভাষায় ও ফর্মে সে আদর্শ বহু কবিতায় রীতিমতো অনায়াস দক্ষতায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানে কাব্যটির বিষয়গত স্ফূর্তির দিকেই বিশেষভাবে নজর দিতে চাই। সকলেই জানেন, কবির বিলাত-বাস এবং তখনকার মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে কবিতাগুলোতে। এতে শুধু বর্তময়তারই মুক্তি ঘটেনি, দেশ-প্রকৃতি-জনগোষ্ঠী মিলে সনেটগুলোতে যে কবি-মানসের প্রকাশ দেখি, তা আধুনিক সংবেদনশীলতাকেই বিশেষভাবে উচ্চকিত করে তোলে। ব্যক্তির স্মৃতিকাতরতা, এবং সে সূত্রে চারপাশের বৃহত্তর বাস্তবের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অনেকগুলো সনেটের অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি। প্রকাশের ক্লাসিক নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষিত হলেও এসব রচনায় আত্মনিষ্ঠ বোধটি মোটেই গোপন থাকেনি।

বাংলা কাব্যধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সাহিত্যিক অর্থে বিদ্রোহী বলে অভিহিত করার রেওয়াজ আছে। উপরে প্রধানত ভাবগত দিক থেকে আমরা তাঁর রচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের যে বিবরণ দিলাম, তাতে সে বিদ্রোহের গভীরতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু এদিক বাদ দিয়ে যদি কেবল বৈচিত্র্যের কথা তুলি, যদি সাহিত্যিক নানা আঙ্গিকে বিচরণের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চাভিলাষ ও সাফল্যের কথা ধরি, তাহলেও বোঝা যাবে, মধুসূদন এক সফল সাহিত্যিক বিদ্রোহী, আর এদিক থেকে বাংলা কাব্যে সম্ভবত জুড়িহীন।

প্রথমে ভাষার কথা বলা যাক। আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছি। এ মন্তব্য তাঁর অনেকগুলো কাব্যের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হবে না। সনেটের ভাষায় তিনি অনেক বেশি মুখের ভাষার কাছাকাছি, আর ক্লাসিক গাম্ভীর্য রক্ষিত হলেও সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহারের আগ্রহ এখানে কম পরিলক্ষিত হয়। এ ভাষা ব্রজাঙ্গনা কাব্যে (১৮৬১) মধ্যযুগের বাংলা কবিতার অনুষঙ্গে গীতিময় সারল্যে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে, শিশুতোষ রচনায় এবং উপদেশমূলক রচনায় ভাষার সারল্য প্রায় কথ্য বাংলার প্রাণ স্পর্শ করেছে। প্রহসনে বিশেষত বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁতে ভাষার কথ্যরীতি ব্যবহারে মধুসূদনের সাফল্যকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ভাষার মতো আঙ্গিকেও মধুসূদন বহুবিস্তারী। ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, পত্রকাব্য, ওড বা সম্বোধনমূলক কাব্য, গীতিকবিতা, সনেট ইত্যাদি বিচিত্র বিভাগে তাঁর যাতায়াত এমন অনায়াসে ঘটেছে যে, এজন্য তাঁকে বাড়তি মহিমা না দিয়ে উপায় নাই। আঙ্গিকের বৈচিত্র্য আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। লক্ষণ দেখে মনে হয়, মধুসূদন বৈচিত্র্যের এ আকাঙ্ক্ষা গভীরভাবে লালন করতেন – একই ভঙ্গিতে বা এমনকি ভাবেও দ্বিতীয় রচনা লিখতে তিনি উৎসাহী হতেন না। সমধর্মী না হলেও ইংরেজি রচনায়ও তিনি প্রকরণ-ভিন্নতার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নিরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে এক দীর্ঘমেয়াদি উচ্চাভিলাষের জন্ম দিয়েছে। সাহিত্যিক সচলতা এবং আকাঙ্ক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছে।

মধুসূদনের জীবন তাঁর সাহিত্যকর্মের মতোই নাটকীয়। তবে শেষ জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর সাহিত্যকে ম্লান করেনি। বহু আগেই তাঁর প্রধান রচনাগুলো শেষ হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরের সাহিত্যিক জীবন তাঁর, যখন রচিত হয়েছিল অজরামর গ্রন্থগুলো। সেখানে মূর্ত হয়ে আছে একটা কালের ভাষ্য, আর কালান্তরের মহিমা। ইংরেজি রচনাগুলোতেও তাঁর কবিত্ব ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু বাংলা রচনার অসাধারণত্ব সেগুলোতে নেই। বলা যায়, ইংরেজি রচনাসহ কিশোরকাল থেকে চর্চার মধ্য দিয়ে যে অসামান্য প্রস্তুতি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, বছর সাতেকের বাংলা রচনায় তার স্বর্ণোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে।

জন্মের দুশ বছর পরে এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের অল্প যে কজন কালান্তরেও ক্লাসিক হিসাবে পঠিত হতে থাকবেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁদেরই একজন।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবহমান শীতের মৌসুমে প্রিয় এই বাংলা

আরিফা খানম

আবহমান কালের ঋতু বৈচিত্রের অপরূপ এই বাঙলায় শীত ঋতু তার স্বমহিমায় ধরা দেয় প্রকৃতির বুকে। অন্যান্য ঋতুর মতোই শীত ঋতুও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস এদেশে শীত পড়ে, তবে মাঘ মাসে শীতের তীব্রতা একটু বেশি থাকে। প্রচণ্ড দাবদাহ পেরিয়ে বর্ষায় স্নাত হয়ে শরৎ হেমন্তের পথ পাড়ি দিয়ে প্রকৃতির বুকে আগমন ঘটে এই শীতের। কুয়াশাঘেরা রাতের আকাশ থেকে ঝরে বিন্দু বিন্দু শিশির কণা। কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করে সকালের সোনালী সূর্যের মিষ্টি সোনা রোদে প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ঘাসের বুকে, গাছের পাতায় মুক্ত দানার মত ঝলমল করে শিশির বিন্দু। সারা প্রকৃতি জুড়ে এ যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। গ্রাম বাংলার মানুষ ও পরিবেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে শীতের এই প্রকৃতি। মূলত হেমন্তের মাঝামাঝি সময় থেকেই শীতের হালকা আমেজ অনুভূত হয়। উত্তরের হিমেল বাতাস জানিয়ে দেয় শীত আসছে। এসময় হিমেল বাতাসে গাছপালা পত্র-পুষ্পহীন হয়ে পড়ে। নদীতে স্রোতের তীব্রতা কমে যায়।

শীত মৌসুমে সত্যি এদেশের প্রকৃতি অন্য রকম সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। গ্রাম বাংলার শীতের সকাল মানেই কুয়াশার চাদরে মুড়ি দেয়া এক অন্য প্রকৃতি। এ সময় গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দেখা যায় নানা রকম সবজি, তরিতরকারির ফলন। শীতের সকালে এদেশের গ্রাম বাংলার অনেক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। তবে শীতের সকালে গ্রামের সবচেয়ে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় বিষয় হলো পিঠা। এদেশের গ্রাম বাংলা জুড়ে নানা পিঠা, পায়েস ও মিষ্টি জাতীয় লোভনীয় খাবারের আয়োজন করা হয় শীত মৌসুমে। রোদে পিঠ দিয়ে খেজুর গুড়ের পায়েস বা শীতের পিঠা খাওয়ার আনন্দ অতুলনীয়। এসময় ঘরে ঘরে পিঠা উৎসব শুরু হয়। ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, দুধচিতই, দুধপুলি, পুলি, ক্ষীরসাপটা, নকশি পিঠা, পাকান পিঠাসহ নানা ধরনের লোভনীয় পিঠা রসনা তৃপ্ত করে খাদ্য রসিকদের। শীতের সকালে গাছ থেকে পাড়া সুমিষ্টি খেজুরের রস খাওয়ার তৃপ্তি অন্য রকম। শীতের এই ঐতিহ্য এদেশের মানুষকে আন্দোলিত করে।

তারই বর্ণনা পাওয়া যায় কবি সুফিয়া কামালের কবিতায়

> পৌষ-পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশিতে বিষম খেয়ে
> আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।

এদেশের মানুষের কাছে শীতের দিনের আকর্ষণ এই সকাল। কুয়াশার সাদা পর্দা ভেদ করে ভোরের সোনালী সূর্য প্রকৃতির বুকে আলো ছড়াতেও সময় নেয়, তাই উত্তরের হিমেল বাতাসে প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে শুরু হয় শীতের কাঁপন। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন সেই চিত্র-

> শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন
> আমলকির এই ডালে ডালে
> পাতাগুলি শির শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল
> তালে তালে।

শীতের সকালে প্রকৃতি আশ্চর্য নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। টিনের চালে, গাছের ডালে, লতায়-পাতায় ঘাসের ডগায় শিশিরের যে সৌন্দর্য তা শুধু শীত ঋতুতেই দেখা যায়। মৌমাছির গুঞ্জরণে মুখরিত হয় হলুদ সরিষার ক্ষেত আর ফুলের বাগান। এসময় গাঁদা, গোলাপ, ডালিয়া, সূর্যমুখিসহ নানা রং এর ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

শীত মৌসুমে এদেশের কৃষিজীবী মানুষ থেমে থাকে না। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে কৃষকরা লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে করে গরু -মহিষ নিয়ে চাষবাসের জন্য খুব ভোরে চলে যায় ফসলের ক্ষেতে। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করেই তারা ফসল ফলায় জীবন ও জীবিকার তাগিদে। গ্রাম গঞ্জে মানুষ এসময় পথের ধারে আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে দলবেঁধে বসে শীত নিবারণের চেষ্টা করে, গল্পে মেতে ওঠে।

নাগরিক জীবনে শীতের মৌসুম অন্য রকম ভালোবাসায় ধরা দেয়। শহরের শীতের সকাল ভিন্ন আমেজে কাটে। শীতের সকালে গ্রামের মত পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গে না। এসময়টা ঘুমের অলসতায় কাটিয়ে দিতে পছন্দ করেন নগরবাসী। যদি না তেমন কাজ থাকে, লেপ কম্বলের নিচে উষ্ণতায় কাটিয়ে দেয় অনেক সময়। যারা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন তারাও ছুটির দিনে বিছানায় শুয়ে শীত উপভোগ করেন, বেশ দেরিতেই বিছানা থেকে ওঠেন। তাই শহরের মানুষ গ্রামের মানুষের মত শীতের তীব্রতা অনুভব করতে পারেন না। শহরের কালো পিচঢালা রাস্তা কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকলেও শিশির ভেজা ঘাসের ছোঁয়ার শীতের যে সৌন্দর্য সেটা লক্ষ্য করা যায় না। গাছ থেকে পেড়ে আনা ঠান্ডা শীতল খেজুরের রস বা ঘরে ঘরে পিঠে পায়েসের সুঘ্রাণ নগর জীবনে নেই। শীতের এই সৌন্দর্য গ্রামীণ জীবনেই দেখা যায়।

গ্রামের মত শীতের এই তীব্রতা শহরে নেই তাই নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের কাছে শীত যেন ভালো লাগার এক অনুভূতির নাম। কবির কথায়-

স্মৃতির শহরে এখন
সুন্দর এক শীত নেমে এসেছে ,
মনোরম এই শীত এখন ধীর পায়ে
হেঁটে হেঁটে
নীরবে আমার
সমগ্র মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে :
কবিতার এ শিশিরভেজা
শীত এখন আমার
আত্মার পরম এক বন্ধু---
('শিশির ভেজা শীতের কবিতা')
জহীর হায়দার

কবি জীবনানন্দ দাশ শীতকে অনুভব করেছেন অন্য এক
দার্শনিকতায়---

এই সব শীতের রাতে
আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে,
কিংবা পাতা,
কিংবা প্যাচার গান,
সেও শিশিরের মতো
হলুদ পাতার মতো।
('শীত রাত')
জীবনানন্দ দাশ

শীতের কুয়াশামাখা ভোরে লেপ কম্বলের ভিতরে শুয়ে আয়েশী জীবন-যাপন করা আনন্দদায়ক, তাছাড়া সকালে নানা পিঠা পায়েস দিয়ে নাস্তা করা, শীতের বিভিন্ন সবজি দিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরি করা সত্যি ভালোলাগার বিষয়। কিন্তু এতোসব ভালো লাগার বাইরেও শীতের কিছু কষ্টকর বিষয় আছে। সাধারণত এদেশের সচ্ছল মানুষের কাছে শীত আরামদায়ক হলেও দরিদ্র মানুষের কাছে কষ্ট বয়ে আনে শীত। প্রচণ্ড শীতে খোলারাস্তায়, রেল-স্টেশনে, বস্তির জীর্ণ ঘরে যারা বাস করেন, যাদের শীত বস্ত্র কেনার মতো সামর্থ্য নেই তাদের জন্য শীত কাল সুখকর নয়। প্রবল শৈত্য প্রবাহে দেশের উত্তরাঞ্চলের জনপদসহ বিভিন্ন স্থানে মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। শহরে ও গ্রামে গরিব মানুষগুলো শীত বস্ত্রের অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করে। ছিন্ন বস্ত্র গায়ে দিয়ে এসব অসহায় মানুষ শীত নিবারণের চেষ্টা করে। প্রচণ্ড শীতে অসহায় মানুষের শীত নিবারণের একমাত্র উপায় সকালের রোদ। আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন শীতার্ত মানুষ সারা রাত অপেক্ষা করে কখন সূর্য উঠবে, সে উত্তাপ পাবে, শীত নিবারণ করবে। এই সব কষ্টে থাকা মানুষের কথাই কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার 'প্রার্থী' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন-

হে সূর্য
তুমি আমাদের স্যাতসেতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও
(প্রার্থী: ছাড়পত্র)
সুকান্ত ভট্টাচার্য

তবে সুবিধা অসুবিধা মিলেই শীত মৌসুম আমাদের অন্তর্জগতে অন্য ধরনের ভালো লাগার অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাই কিছু সমস্যা থাকলেও শীত এদেশের মানুষের পছন্দের ঋতুর নাম। যারা ঘুরতে ভালোবাসেন, প্রকৃতিকে কাছে থেকে উপভোগ করতে চান তারা পাড়ি দেন পছন্দের বিভিন্ন জায়গায়। অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র সৈকত মুখরিত হয়, নগর জীবনে অভ্যস্ত মানুষের পদচারণায়। যারা সারা বছর ব্যস্ত থাকেন কাজে তারা অনেকেই বছরের এই সময়টাকে বেছে নেন ঘুরতে যাবার জন্যে। অনেকেই কুয়াশাঘেরা নীরব প্রকৃতিকে উপভোগ করতে গ্রামীণ পরিবেশ পছন্দ করেন। তারা গ্রামে যান শহরের কোলাহল ছেড়ে। যারা ঘুরতে পছন্দ করেন, তাদের কাছে শীত মানেই ভ্রমণের হাতছানি। কর্মব্যস্ত জীবন থেকে একটু অবসর নিয়ে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া।

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে প্রকৃতির নানা সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যকে কাছ থেকে উপভোগ করতে শীত ঋতুর জুড়ি নেই। সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, কক্সবাজার, কুয়াকাটা বা সুন্দরবন--- সব জায়গাতেই প্রকৃতির সৌন্দর্যের সুনিপুণ ছোঁয়া। এই সৌন্দর্যকে, এই প্রকৃতিকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে শীত ঋতুই আসলে সর্বোত্তম এক ঋতু। তাই ফুল, ফসল আর সৌন্দর্য ভরা শীতের এই মৌসুম, বাংলার মানুষের পছন্দের এক ঋতু।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স

সম্পর্ক

মজিদ মাহমুদ

মেয়েটিকে আব্দুল কুদ্দুসই প্রথম দেখেছিল। টংঘর থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির ডাকে নদীর ধারে গিয়েছিল। তখন ঠিক শীত পড়ে নাই। তবু কার্তিক মাসের শুরুতে নদীতে টান ধরেছিল। সকালে এক-আধটু কুয়াশা। ম্যার-মেরে শীতের আগমনও টের পাওয়া যায়। হুড়মুড় করে প্রকৃতির ডাকে বেরিয়ে পড়েছিল। কোনোদিকে তাকানোর ফুরসৎ ছিল না। শাকপাতা খাওয়া পেট। কামড় দিলে রেহাই নেই। তাছাড়া তখনো পুরোপুরী ফরসা হয়নি। কোনো দিকে ঠাহর করার জো ছিল না।

কাজ সেরে আব্দুল কুদ্দুস নদীর ধারে যায়। তবে পারতোপক্ষে নদীতে এ কাজটি করতে চায় না সে। নদীতে খোয়াজ খিজির থাকে। পানির ফেরেশতা। তাকে অপবিত্র করা হয়। তাছাড়া আজকাল এনজিও কর্মীরা দেখা হলেই বলে- নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করা ঠিক না। রোগ-বালাই ছড়ায়। কলেরা-আমাশা হয়। কিন্তু না করে তো উপায় থাকে না। নদীর ধারে কাশবনে বাস। নদীর ধারের খাস জমিতে কাশবন মাথা তোলে। শত শত বিঘা খাস জমি। বেওয়ারিশ এসব জমির মা-বাপ নেই। লাঠির জোর যার-জমির মালিকানা তার। আব্দুল কুদ্দুস এ জমির মালিক না। এ জমির মালিক রফি পরামানিক। কুদ্দুস তার বান্ধা চাকর। মাস-মায়না নয়। বছরের হিসাবে ১২ মন ধান আর ৬ হাজার টাকা। এছাড়া দুইটা লুঙ্গি, দুইটা গামছা, একটা জামা এবং শীতের একটা চাদরও দেয়। টাকার হিসাবে বেতন বেশি নয়। প্রতিদিন শ্রম দিলে এর চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিদিন শ্রম বেচা যায় না। সব সময় শ্রমের বাজার ঠিক থাকে না। বছরবান্ধায় সে অনিশ্চয়তা থাকে না। নিজের খাওয়া পরার চিন্তা করতে হয় না।

কুদ্দুসের বড় ভাই আব্দুর রহিমও রফি পরামানিকের বছরবান্ধা চাকর। তার বাপও তাই ছিল। দাদার হিস্টরি জানে না।

বাপ মারা যায় অল্প বয়সে। সে সব হিসেব কুদ্দুস রাখে না। কুদ্দুস এককুড়ি পর্যন্ত গুনতে জানে। কুড়ির পরে সব সংখ্যা তার কাছে বাহুল্য মনে হয়। আগামীকালের পরে তার দিনক্ষণের দরকার হয় না। আর দরকার হলে তো তার ভাই আব্দুর রহিম আর পরামানিক রয়েছে। তারা তো আর তাকে ঠকাবে না। অবশ্য ঠকানো শব্দটির সঙ্গে তার পরিচয় নেই। দুনিয়াবি সব কিছুই তার ভালো। খারাপ বলে কিছু নেই। আল্লার দুনিয়ার এত ভাবার কিছু নেই। আল্লা যা কিছু করে ভালোর জন্য করে।

যাক, কুদ্দুসকে নিয়ে এতকিছু বলার দরকার পড়ে না। কুদ্দুস এমন কোনো মানুষ নয় যার জীবনের সবটা পরিচয়ের দরকার আছে। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে কিঞ্চিৎ ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল। এ গল্পটি আমি তাদের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। কুদ্দুস কিংবা রহিমের কাছ থেকেও হতে পারে; কিংবা তাদের কোনো ঘনিষ্টজনের কাছ থেকে শুনতে পারি।

কুয়াশার মধ্যে কুদ্দুসের প্রথমে মনে হলো তার মতো কেউ এখানে প্রকৃতির ডাকে এসেছে। তাই মুখ ফিরে নিয়ে চলতে থাকলো। কিন্তু এ চরে তো কারো আসার কথা নয়। তাহলে ভূত-পেত্নী নয় তো! কুদ্দুস কোনো দিকে তাকায় না। বড়কুল

পড়ে বুকে ফুঁ দেয়। কোনো দিকে তাকায় না। কিন্তু কিছুদূর এসে কৌতূহল ঠেকাতে পারে না। চোখ মুছে ভালো করে তাকায়। দেখে, না সত্যিই মেয়ে মানুষ। তার শরীর মাটির সঙ্গে লাগানো আছে। ভূতটুত হলে তো কিছুটা শূন্যে থাকতো। ভূত মাটিতে পা দিতে পারে না।

কুদ্দুস কিছুক্ষণ ইতস্তত করে। তার ভাবনায় মেলে না। এখানে মেয়ে মানুষ আসবে কোথা থেকে। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে কোনো বাড়িঘর নেই। কাশবনের গা লাগোয়া পদ্মা। পানিতে ভেসে ভেসে তো এতদূর কেউ আসতে পারে না। এসব ভাবতে ভাবতে আকাশ কিছুটা ফরশা হয়ে আসে। পুবকোণে হলুদরেখা ফুটে উঠে। তাছাড়া অল্পতে কুদ্দুস ভয় খায় না। গায়ে অসুরের মতো শক্তি। কুমির টেনে ডাঙায় তুলেছিল- তার এ গল্প এলাকায় সবাই জানে। তাই সহজে কেউ ঘাটায় না। তবে ভূত-পেত্নি হলে তো কিছু করার নেই। ওরা তো মানুষ না- ছায়া। ছায়ার সঙ্গে তো লড়াই করা চলে না।

তবে কাছে গিয়ে আব্দুল কুদ্দুসের মনে হলো- না, ছায়া নয়। এমনকি প্রকৃতির ডাকেও কেউ আসেনি। মাটি কাদায় লেপ্টে আড়মোড়া ভাঙা একটি মেয়ে। বয়স অনুমান করার ক্ষমতা কুদ্দুসের ছিল না। এক কুড়ি না হলেও দুই কুড়ির কম। ছোটবেলায় মা মারা গেছে। গ্রামে দুএকটা মেয়ে মানুষ দেখেছে। তাদের আলাদা কোনো স্মৃতি নেই। কিন্তু নদীর ধারে পড়ে থাকা এই বিস্রস্ত মেয়েটি দেখে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠে। তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সঞ্চিত পুরুষ মানুষ জেগে উঠে। আর এ ধরনের জাগরণ মেয়েটির প্রতি তার মমত্ব জাগিয়ে দেয়। এতদিন ভাই ছাড়া তার নিজের কেউ ছিল না। অচেনা মেয়েটিকে তার নিজের বলে ভাবতে ইচ্ছে হয়। আর সে ইচ্ছে থেকেই মনে হলো মেয়েটির উপর দিয়ে রাতে একটা কষ্ট গিয়েছে। হয়তো খাওয়া হয়নি। কিন্তু কিভাবে সে এখানে এলো। এরকম একটি প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ছিল। পরে সে জেনেছিল, গোয়ালন্দ থেকে কিছু লোক তাকে নৌকায় তুলে এনেছিল। সারারাত তাদের নৌকায় ছিল। লোকগুলো তাকে সারারাত কোথাও মেরেছে। তারপর কি যেনো খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘুম ভাঙতেই সে নিজেকে এখানে আবিষ্কার করে।

কুদ্দুস এত সব বোঝে না। গোয়ালন্দ কোথায় তাও সে জানে না। গোয়ালন্দ যেখানেই হোক, মেয়েটিকে তার মনে হয় পরী। মনে একটু ভয়ও লাগে। জলপরী নয় তো! তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পানির নিচে পাতাল-পুরীতে নিয়ে যাবে না তো! কিন্তু মেয়েটির যাদু থেকে সে রক্ষা পায় না। হাত-পা অবশ হয়ে আসে। আবার তাকে ছেড়ে কোথাও যেতেও পারে না।

মেয়েটি পানি চাইলে হাতের বদনাতে নদী থেকে পানি আনে। মেয়েটিকে দেয়। মেয়েটি ঢকঢক করে পানি খায়। কিছুটা পানি চোখে মুখে ছিটা দেয়। বলে, এটি কোন গ্রাম। কুদ্দুস উত্তর দেয়, ডিক্রির চর।

গল্পের এই সূচনাটুকু না বললে পাঠক ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না মেয়েটি কোথা থেকে এলো। গোয়ালন্দ থেকে একটি মেয়ে রাতের বেলা কিছু লোকের সঙ্গে নৌকা যাত্রা করতে পারে এ কথা তো ঠিক। রাতের অত্যাচার শেষে নদীর চরে তাকে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারে এটাও তো ঠিক। তবে কুদ্দুসের জগতে গোয়ালন্দ নেই। গোয়ালন্দ চর শানিরদিয়ারের মতো একটি গ্রাম। চোখের সীমানা কালো হয়ে এলে যাকে দেখা যায়। সেও তো রূপকথারই একটি জগৎ।

কুদ্দুসের কাছে কোনো খাবার আছে কিনা জানতে চায় মেয়েটি। কুদ্দুস দ্রুত টঙয়ে ফিরে যায়। যবের ছাতু, মুড়ি আর গুড় নিয়ে ফিরে আসে। নদী থেকে পানি এনে দেয়। গোলাকার টিনের থালে ছাতুগুলো পানিতে মেখে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। সারারাতের ক্লান্তি ভোলে। ক্ষুধা ভোলে। জানতে চায়- কুদ্দুস কোথায় থাকে। জানতে চায়- তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে কিনা। ততক্ষণে মেয়েটির মোহ কুদ্দুসকে পেয়ে বসেছে। মেয়েটির সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। মুহূর্তের মধ্যে নিজের এ পরিবর্তন তার চোখে পড়ল। যে কুদ্দুস নিজে কিছু ভাবতে পারে না। তার সমগ্র জগৎ তার ভাই আব্দুর রহিম কেন্দ্রিক। আব্দুর রহিম ছাড়া তার দুনিয়া নেই। আব্দুর রহিম বিয়ে করবে। ভাবী তাকে আদর করবে। তাদের ছেলে মেয়ে হবে। সেই ছেলে মেয়েকে নিয়ে তার কেটে যাবে সময়। এই মেয়েটিকে তার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার কথাও ভেবেছিল সে। এখন ভাবনাটা ভাগ হয়ে গেছে। তাছাড়া ভাই যদি বলে এ মেয়ে তুই কোথাই পেলি। মেয়েটিকে একা ফেলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো তাদের টংঘরে।

আব্দুর রহিম আরো সকালে উঠে চলে গেছে মহিষের বাথানে। এই কাশবনের পাহারা ছাড়াও তার মালিকের রয়েছে গোটা বিশেক মহিষ। তার মধ্যে বেশ কয়েকটা দুধ দেয়। দুইভাই পালা করে এই মহিষ দেখাশোনা করে। দুধ দুইয়ে জ্বাল দিয়ে রাখে। সর থেকে ঘি তৈরি করে। নিজেরা খায়। সপ্তাহে শুক্রবার সকালে আব্দুর রহিম দুধ নিয়ে, ননি নিয়ে রফি পরামানিকের বাড়িতে যায়। সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসে। সঙ্গে আনে চালডাল নুন ও কুপি জ্বালানোর তেল। নদীতে গোসল করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মাছ ধরে আনে। একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রায় সবটাই তাদের রয়েছে। জীবনে কোনো কষ্টের বোধ তাই তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। সংসারের রীতি অনুসারে একদিন তাদের বিয়ে করতে হবে সে কথা ভাবলেও মেয়ে মানুষের জন্য আলাদা কোনো কষ্ট তারা টের পায়নি। এমনকি মায়ের জন্যও নয়।

মেয়েটিকে টংঘরে রেখে আব্দুল কুদ্দুস বড় ভাই আব্দুর রহিমের কাছে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। এরকম একটি অদ্ভুত ঘটনায় আব্দুর রহিম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। রহিমের বোধশোধ কুদ্দুসের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। বলে, এডা তুই কি করচিস কুদ্দুস? অচিনা মেয়ে মানুষ ঘরে তুইলা আনচিস? এতে গুণা হইব না? মানষ্যে জানলে একঘরে করবে না?

তবু রহিম কৌতূহল থামাতে পারল না। হাতের কাজ দ্রুত সেরে বাথানে ফিরে এল। এবং মেয়েটিকে দেখে তারও কুদ্দুসের দশা হলো। সত্যিই সেও তো এর আগে মেয়ে মানুষ দেখেনি। যুবতি মেয়ে একান্ত কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা এই তাদের প্রথম। মেয়ে মানুষের জন্য বুকের কোণে যে একটি ব্যথা থাকে তারা এর আগে টের পায়নি। মেয়ে মানুষকে বুকের কাছে টেনে নেয়ার ইচ্ছা এই তারা প্রথম টের পেল। এরপর দুইভাই আর কোনো কথা বলল না। এমন

একটা নির্জন বনের ধারে তাদের বাস। লোকজন তেমন একটা কেউ আসে না। মহিষের দুধ, কোলের মাছ– খাওয়ার খুব একটা কষ্ট নেই। কিন্তু বেশিদিন তো আর এমন বেগানা মেয়েমানুষকে নিজেদের কাছে রাখা যাবে না। এ বোধ তাদের আছে।

এসব ভাবনার মাঝে সন্ধ্যা হয়ে আসে। কুপিতে তেল ঢালে কুদ্দুস। সলতে ঠিক করে। মাটিতে গর্ত করে কাটা চুলায় রহিম ভাত চড়ানোর আয়োজন করে। এতক্ষণে মেয়েটি অনেক স্বাভাবিক হয়ে আসে। বলে, ভাইজান আমি রাধতে জানি। তারপর সব আয়োজন সেই করে। তারপর তিন জন একত্রে খেতে বসে। খাবার স্বাদ আজ রহিম ও কুদ্দুসের কাছে অন্য রকম মনে হয়। মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় তারা। সংসার জীবনের আনন্দ বুঝতে পারে তারা। দুই ভাই মেয়েটিকে নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ সংসারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু তাদের গোপন কথা কেউ জানতে পারে না। কুদ্দুস মেয়েটিকে পেয়েছে; তাই মেয়েটির প্রতি তার হক ষোল আনা। ভাই যে মেয়েটির কথা ভাবতে পারে একথা তার কল্পনাতে আসেনি। অন্যদিকে রহিম ভাবে কুদ্দুসের সব চিন্তা তাকে নিয়ে। তাছাড়া সে বিয়ে করলেই না কুদ্দুসের কথা।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে তারা বেশ সমস্যায় পড়ে। একটি মাত্র টংঘর। তার পুরোটা জুড়ে একটি মাত্র মাঁচা। একটি কাঁথা ও দুটি বালিশ দুই ভাই ভাগাভাগি করে নেয়। কিন্তু তৃতীয় জনকে শোয়ানোর জায়গা তাদের নেই। তাছড়া মেয়ে মানুষ। একসঙ্গে জড়িয়ে কুড়িয়ে তিন জনের থাকা চলবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে তারা ঘরের মাঁচানে শোয়ায়। দুই ভাই কাশবন বিছিয়ে ঘরের বাইরে মাচার নিচে শুয়ে থাকে। কারো ঘুম আসে না। মেয়েটিকে নিয়ে তাদের স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। তাদের বাপ ছিল না। মা মারা গেছে বহুকাল আগে। তাদের ঘর সংসার বলতে রফি পরামানিকের বাড়ি। আর তাদের হালি-কৃষাণকে কেন্দ্র করে তার জগৎ। সে জগতে মেয়ে মানুষ নেই। সুখ-দুঃখে কারো অংশিদারিত্ব নেই। দুই ভাই আদি পিতার সন্তান হাবিল কাবিলের মতো বেড়ে উঠেছে। একটি মেয়ে মানুষকে নিয়েই কি শুরু হবে তাদের মধ্যে হাবিল কাবিলের দ্বন্দ্ব। এ সব ভাবতে ভাবতে দুজনই বুঝি শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেয়েটি এসে প্রথম তাদের জাগিয়ে দেয়। এই এক দিনের মধ্যে তারা একটি পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ে।

রহিম কুদ্দুসকে বলে, চল আমরা আরেকটি টং বানাই। ওকেও থাকতি দিতে হবি তো। দুইভাই ফুটন্ত কাঁশ কেটে আনে। কচি কাঁশের পাতা দিয়ে বাঁধন দেয়। মুলিবাঁশ দিয়ে চাঙ তৈরি করে। তাদের একটি টংয়ের পাশে আরেকটি টং ওঠে। একটি বাড়ির স্বপ্ন জেগে ওঠে তাদের মনে।

শুক্রবার রহিম যথারীতি গ্রামে যায়। পরামানিকের বাড়ি থেকে সপ্তাহের চাল-ডাল-নুন-তেল আনতে হবে। কিন্তু বন থেকে বেরুতে গিয়ে প্রথম টের পেল– এই বনের মধ্যে কোথায় যেন টান ধরেছে। কি যেন ফেলে রেখে যাচ্ছে। ফেরার পথে রহিম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে অপরিচিত দোকান থেকে একটি শাড়ি, কিছু স্নো পাউডার, চিরুনি আয়না কিনল। কেউ দেখে ফেলার ভয়ে কাজটি সাবধানতার সঙ্গে করল। মনে মনে অনেক কথা ভাবল। এখনো মেয়েটির দেশের বাড়ির কথা জানা হয়নি। গোয়ালন্দ না কোথায় যেন বলেছিল। গোয়ালন্দ কোথায় রহিম জানে না। রহিম পরিচিত দু'এক জনের কাছে গোয়ালন্দ কোথায় জানতে চায়। সবাই তাকে সন্দেহ করে। তার দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকে। বলে, গোয়ালন্দ দিয়ে তুই কি করবি? রহিম বলেছে এমনিতেই। দোস্ত হাবিল নিকারি তাকে কথা দিয়েছে, একদিন তাকে নিয়ে গোয়ালন্দ যাবে। ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে মানুষ থাকে। এখান থেকে নৌকায় করে যেতে হয়ে। এখান থেকে দশ ক্রোশ মতো পথ। ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। পান্তা খেয়ে নাও ছাড়লে দুপুরের মধ্যে পৌঁছান যায়।

রহিম অন্যদিনের তুলনায় একটু আগেই ফিরে আসে। টঙের আঙিনায় পা রাখতেই কুদ্দুসের উপস্থিতি টের পায়। মেয়েটি আর কুদ্দুসের হাসির শব্দ শুনতে পায়। দুজনেই টঙের ভেতর বসে আছে। মেয়েটি বলছে তুমি কি আমাকে বিয়ে করবা? আমি কোল খারাপ মেয়ে মানুষ। তই তুমি বিয়ে করলে আর খারাপ কাজ করুম না।

এসব কথা রহিমের কানে যেতে তার সব চিন্তা ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবু জোরে হাঁক ছেড়ে, কাঁশবনের আবরণ ছিন্ন করে টঙে প্রবেশ করে। শাড়ি ও স্নো-পাউডার দেখে মেয়েটি খুশি হয়। মেয়েটির খুশি দেখে রহিমের এতক্ষণের হতাশা কিছুটা কেটে যায়। তারা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এক সঙ্গে রাতের খাবার খায়। এমনি করেই কাটে প্রান্তজনের জীবন। সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা আর আনন্দে। পরামানিকরা তাদের জীবন আর মনের খবর কতটুকুই বা জানতে পারে।

লেখক: কবি ও গল্পকার

আমরা মানুষ

মৌরুসি মঞ্জুষা

আমরা দুঃখ আগলে বাঁচি।
পথিমধ্যে প্রিয়জন ছেড়ে যায়;
আমরা কেবল বিরহ আঁকড়ে শুয়ে থাকি,
পরিপাটি বিছানাকে এলোমেলো করি।
কখনো বা আধো রাতে জেগে উঠি,
মৃদু আলোয় যোগ দিই কাব্য মিছিলে।

আমরা অকারণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি-
ভীষণ সতর্কতায় শোনার চেষ্টা করি
দুজন রিকশাচালকের সাংসারিক কথোপকথন কিংবা
কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক।
আমরা শত ব্যস্ততার মাঝে থেকেও
হুটহাট অতল গভীরতায় তলিয়ে যাই।
আমদের ভালো থাকতে নেই।

আমরা মানুষ।
আমাদের শিল্প আছে, সাহিত্য আছে;
শিল্পে বেদনা সুন্দর; সাহিত্যে দুর্নীতি।
দীর্ঘকালীন আনন্দ আমাদের তিক্ত লাগে;
সুখকে লাগে সরলরৈখিক।
আমাদের কামনা জুড়ে রয়েছে বক্রতা,
আশা জুড়ে রয়েছে নৈরাশ্য।

আমরা মানুষ।
অপ্রাপ্তিকে আমরা উপভোগ করি,
অশ্রুকে ভাবি অস্ত্র।
চিৎকার করে কাঁদার সুযোগকে উপেক্ষা করে
আমরা মুখ চেপে কাঁদি;
বুকের মধ্যে প্রতিনিয়ত কষ্ট জমাই,
মনস্তাপের পাহাড় গড়ি।
আমরা আজীবন জ্বালিয়ে রাখতে চাই
হৃদমাঝারের লেলিহান শিখাকে,
আমরা দগ্ধ হতে চাই বারবার।

আমরা মানুষ।
দুঃখবিলাস আমাদের নেশা,
দুর্ভাগ্য আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি।
সুখে থাকলে আমরা করুণ চোখে কষ্ট খুঁজে বেড়াই,
বৃহৎ সাফল্যে অতীতের তুচ্ছ ব্যর্থতাকে মুখ্য করে তুলি।
আমরা কেউ ভালো নেই।
কারণ আমরা মানুষ;
আর অন্তর্বেদনা ব্যতীত মানুষ অর্থহীন,
সুখেই মানুষ অসুখী....

কখনো তুমি

ফওজিয়া হালিম অনু

কখনো তুমি প্রস্ফুটিত গোলাপ
ঝুল বারান্দায় ঝুলে থাকা মুগ্ধ
নান্দনিকতা।
কখনো তুমি ভীষণ ফিকে ভুল মিথ্যে অযাচিত বাতুলতা!

কখনো তুমি আরোধ্য প্রেম
অমৃত সুধা,
আকণ্ঠ করি পান।
কখনো তোমায় ভুলতে না
পারায় হৃদয় ম্রিয়মান।

কখনো তুমি জলজ বাতাস
সোঁদা মাটির গন্ধ।
কখনো তুমি ভরা পূর্ণিমা
স্বচ্ছ নীলাকাশ!

কখনো তুমি বিষের পেয়ালা
ধারণ করে,
নীলকণ্ঠ হই আমি
যখন উচ্ছ্বসিত অট্টহাসির
প্রলয় তোলো তুমি!

হেমন্ত যেই শেষ হলো ঐ

শাহান আরা জাকির

হেমন্ত যেই শেষ হলো ঐ শীতের বুড়ি এলো,
হিমপাহাড়ের শীতল হাওয়া ছড়িয়ে
যে সে দিলো....
নবান্নতে মুরকি মোয়া শীতে পিঠা পুলি,
খেজুর রসের দারুন মজা গাছে থাকে ঝুলি....
হিমেল হাওয়ায় গরিব দুখি কষ্ট পেলেও তবে,
শীত এলে এই বাঙালি যে মাতে নানা উৎসবে....
শীতের কাথা মুড়ি দিয়ে দারুণ মজা ঘুমুতে,
সকাল হলে রৌদ্র এসে ঘুম ভেঙে দেয় চুমুতে....
রাতের বেলা জমে ওঠে বাউল পালার আসর,
চিতই পুলি ভাপা পিঠা চলে সারা রাতভর
গরিব কাঁপে শীত এলেই যে নানান রোগে ভোগে,
তাদের দিকেও হাত বাড়াবো সবাই একযোগে....
দুঃখ সুখের জীবন নিয়েই আমরা চলি একসাথে,
ঋতুর পরে আর এক ঋতু তার স্বভাবে মাতে....
বসন্তকে খবর পাঠায় শীতের বুড়ি চিঠি লিখে,
আমার পালা শেষ এখানে যাব এখন অন্যদিকে....
যাবার সময় শীত বলে যায় বসন্ত
কে দেব ঠেলে,
পাল্টে যাবে এই ধরনী বসন্তেরই ছোয়া পেলে....

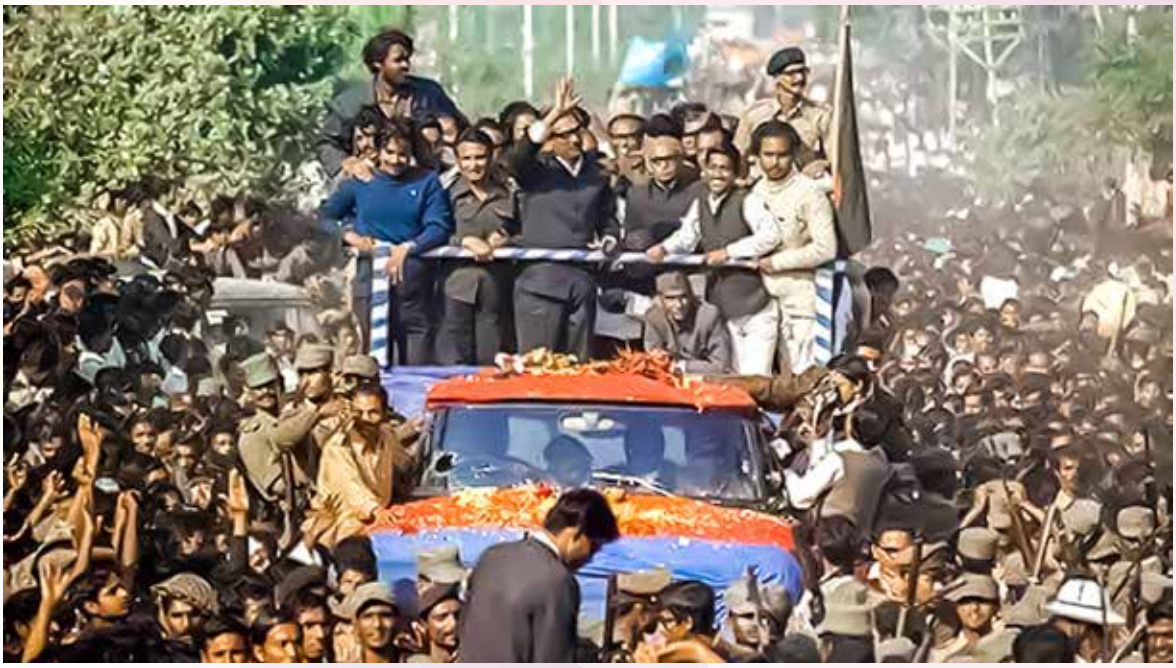

জাতির পিতার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মোহাম্মদ শাহজাহান

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের ৪ দিন পর ২০ ডিসেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়াকে হটিয়ে পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের গদি দখল করেন। আসলে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী থেকেই শেখ মুজিব তখন বিশ্বনেতায় পরিণত হয়ে যান। বিশ্ব জনমতের চাপ এবং অবশিষ্ট পাকিস্তানকে রক্ষার জন্যই বাংলার নেতা মুজিবকে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ মুক্তি দেয়া হয়। লন্ডনের টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখে– 'মুজিবের মুক্তিতে বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।' গার্ডিয়ান লিখে, 'শেখ মুজিব ঢাকার মাটিতে পা রাখামাত্রই নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।' বৃটেন প্রবাসী সাংবাদিক আবদুল মতিনের লেখা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের পর' গ্রন্থ থেকে নিচের অংশটুকু মুদ্রিত হলো।

২১ ডিসেম্বর নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বিদেশী কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানকে শিগগিরই মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হবে।'

এ সময় লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিদানের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ২১ ডিসেম্বর 'দি গার্ডিয়ান'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়, 'কেবল শেখ মুজিবুর রহমান এই অবনতি রোধ করতে পারেন। তাঁকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে একদিনও দেরি করা চলবে না।'

একই তারিখে লন্ডনের 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'রাজনীতি, কূটনীতি ও মানবতার খাতিরে শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া উচিত। এর ফলে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা তাদের অবিসংবাদী নেতাকে ফিরে পাবে এবং মি. ভুট্টো ও পাকিস্তান গণতান্ত্রিক বিশ্বের, বিশেষ করে ভারতের অভিনন্দন ও আস্থা অর্জন করবে। বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে মি. ভুট্টো এখনও 'অখণ্ড পাকিস্তান'-এর কথা বলছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ প্রশ্ন অবান্তর।'

২২ ডিসেম্বর (১৯৭১) 'মুজিবনগর' থেকে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ 'দি টাইমস'-এর প্রতিনিধিকে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ফলেই শেখ মুজিবের স্বপ্ন সফল হয়েছে।'

(দি টাইমস, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১)

২৩ ডিসেম্বর উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি অফিসার মহল থেকে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে রাওয়ালপিণ্ডিতে নিয়ে আসা হয়েছে। ন'-মাস-কাল বন্দী থাকার পর ২২ ডিসেম্বর তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ('দি গার্ডিয়ান', ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)

২৭ ডিসেম্বর রাত্রিবেলা প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা' হিসেবে উল্লেখ করে মি. ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, "আমি বৈঠক থেকে সরাসরি এখানে এসেছি। এই পদক্ষেপ নেওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু এটার প্রয়োজন ছিল। বহুদিন আগেই এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।"

২৮ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডি থেকে 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস'-এর প্রতিনিধি কেভিন র‍্যাফার্টি প্রেরিত সংবাদে বলা হয়, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মি. ভুট্টোকে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করার উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করার আগে তাঁকে (শেখ মুজিবকে) তাঁর দেশের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সময় দিতেই হবে।'

এই সংবাদে আরও বলা হয়, 'জেনারেল ইয়াহিয়ার আমলে বন্দী থাকাকালে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি এবং নির্জন সেলে রাখার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এখন তিনি আগের তুলনায় অনেকটা সুস্থ রয়েছেন এবং তাঁকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো হয়েছে।'

১ জানুয়ারি ১৯৭২ মার্কিন সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হয়, 'আগামী দু-একদিনের মধ্যে বাংলাদেশের বন্দী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার কথা প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বিবেচনা করছেন।'

ব্রিটিশ লেখক রবার্ট পেইন তাঁর একটি বইয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক বজায় রাখবে কিনা, সে সম্বন্ধে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু ও মি. ভুট্টোর কথপোকথন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আলোচনার এক পর্যায়ে শেখ মুজিব ভুট্টোকে বলেন, "আমি এখনও পর্যন্ত আপনার বন্দী। এমন কি আমার স্ত্রীকে আমি টেলিফোন করারও অধিকারী নই। আমি জানি না, তিনি এখনও জীবিত আছেন কিনা। আমার ছেলেমেয়েরাও কী জীবিত আছে? আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা কী জীবিত আছেন? আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে কীভাবে, আমার সামনে আপনি যে কাগজের টুকরো রেখেছেন, তাতে আমি দস্তখত করতে পারি? আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি আমাকে জোর করে রাজি করাবার চেষ্টা করছেন। আপনি আমাকে গুলি করতে পারেন কিন্তু ঢাকায় গিয়ে আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো কাগজে দস্তখত দেবো না। আমাকে এখানে আটক রাখা হলে আমি আপনার বন্দী এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আমার দস্তখত গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। কাজেই এখন থেকে আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্তি দেওয়া হয়, আমি নীরব থাকবো।

ভুট্টোর শেষ অনুরোধ: একটি অখণ্ড এবং অবিভাজ্য পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন, নাকি করবেন না? "শেখ মুজিব নীরব থাকেন।" (The Tortured and the Damned, Robert Payne, P. 146)

৩ জানুয়ারি ১৯৭২ বিকেলবেলা করাচী শহরের নিস্তার পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মি. ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তিদান করা হবে।'

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি. ভুট্টো বলেন, "২৭ ডিসেম্বর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'আমি কি মুক্ত?' আমি তাঁকে বলেছি, 'আপনি স্বাধীন। আপনি যদি আমাকে কিছু সময় দেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমার জনগণের মতামত যাচাই করতে পারবো। তাদের সম্মতি ছাড়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না।"

বঙ্গবন্ধুকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় : "শেখ মুজিবই বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বিস্ময়কর বাগ্মিতার মাধ্যমে তিনি বাঙালিদের অসন্তোষকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পরিণত করেন। তাঁর বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভবিষ্যতে সুদিনের মুখ দেখার ভরসা পায়। তাঁকে যদি হত্যা করা হতো, কিংবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হিসেবে রাখা হতো, তাহলে বাংলাদেশ সরকার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মারাত্মক নেতৃত্ব সংকটের মুখোমুখি হতো। তাঁর মুক্তি বাংলাদেশকে বাঁচার একটি সুযোগ দিয়েছে।" (দি গার্ডিয়ান, ৪ জানুয়ারি ১৯৭২)

৪ জানুয়ারি রাত্রিবেলা পাকিস্তান রেডিও প্রচারিত বাংলা প্রতিবেদনে বলা হয় : "ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করার জন্য শেখ মুজিবকে শিগগিরই পূর্ববঙ্গে পাঠানো হবে।"
(দি গার্ডিয়ান, ৫ জানুয়ারি ১৯৭২)

৬ জানুয়ারি সিন্ধু প্রদেশের লারকানা সফররত মি. ভুট্টো বলেন, 'তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য ঢাকা সফর করতে রাজি আছেন।... এটা এখন পরিষ্কার, আমি অথবা আর কেউ মুজিবকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তাঁর চিন্তা-চেতনার অধিকারী তিনি নিজেই।'
(দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, ৭ জানুয়ারি ১৯৭২)

৭ জানুয়ারি ৭টি (তৎকালীন) কমিউনিস্ট দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করবে বলে আভাস পাওয়া যায়। এসব দেশের নয়াদিল্লিস্থ রাষ্ট্রদূতরা পৃথকভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দিল্লি বিমানবন্দরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যারা অভ্যর্থনা জানান, তাদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি ও মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রদূতবৃন্দ। শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের অব্যবহিত পরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে বলে রাষ্ট্রদূতরা মি. আজাদকে আভাস দেন।
(দি টাইমস, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২)

৮ জানুয়ারি সকাল ৭টায় বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে প্রচারিত খবরে বলা হয়, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিমানযোগে লন্ডন আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।' সকাল সাড়ে ৬টার সময় বঙ্গবন্ধু হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান।

সকাল ৮টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে আসা হয়। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার আপা পন্থ বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এসে হাজির হলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে একটি অভিনন্দন বাণী পাঠান। এই বাণীতে তিনি বলেন : 'আপনি বন্দী ছিলেন, কিন্তু আপনার চিন্তাশক্তি ও চেতনাকে কারারুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপনি নিপীড়িত জনগণের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী) হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি 'গুড মর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট' বলে বঙ্গবন্ধুকে সম্ভাষণ করেন।

ব্রিটিশ টিভি সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টও এসে হাজির হন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি চান। বঙ্গবন্ধু বলেন : 'ব্রিটিশ টেলিভিশনের জন্য আমি ইন্টারভিউ দেবো, কিন্তু তার জন্য তোমাকে বাংলাদেশে আসতে হবে। আমার প্রথম ইন্টারভিউ হবে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য। আমি কথা দিচ্ছি, বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে

তোমাকেই আমি প্রথম ইন্টারভিউ দেবো।'
'গত দশ-এগারো মাস যাবত স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার ফলে পরিশ্রান্ত বাঙালিরা দলে দলে এসে হোটেল ঘিরে ফেলেছে। মুহুর্মুহু 'জয় বঙ্গবন্ধু' ও 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে তারা আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলে। হোটেলের বাইরে যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই অগণিত লোক। দেখেই বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুর শরীর অত্যন্ত দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর গায়ে শক্তি নেই; তিনি থর থর করে কাঁপছেন। তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, আপনি তো পড়ে যাবেন। তিনি কারো কথা শুনলেন না। জানালা থেকে ফিরে এসে কয়েক মিনিট বসে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে তিনি হাত তুলে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।' (মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালির অবদান, শেখ আব্দুল মান্নান, পৃ. ১২০)
দুপুরের দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।
মিয়ানওয়ালী জেলে নিঃসঙ্গ কারাবাসের সময় তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এবং তাঁর সেলের পাশে কবর খোঁড়ার কথা বঙ্গবন্ধু সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। মুহূর্তে মুহূর্তে কারা প্রহরীরা এসে তাঁকে জীবনের ভয় দেখিয়েছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এক মুহূর্তের জন্যও আমি বাংলাদেশের কথা ভুলিনি। আমি আমার নিজের জন্য প্রাণ ধারণ করছিলাম না। আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার সুযোগ পাবো না কিন্তু আমার জনগণ মুক্তি অর্জন করবে। আমাকে যদি তারা হত্যাও করে তাহলেও আমার জনগণ মুক্তি অর্জন করবে, এ সম্বন্ধে কখনো আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।"
বঙ্গবন্ধু বললেন : "পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আপস হতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে দর কষাকষির কথাই ওঠে না। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পাকিস্তান আমার কাছে অন্য যে কোনো একটি দেশের মতো। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান একটি জাতি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমার জনগণ বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। তারা তাদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে। আমি কখনো তাদের অসম্মান করবো না, এমনকি আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি এই প্রতিশ্রুতি পালন করবো।"
৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সন্ধ্যাবেলা বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যান। ঘরোয়া আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মি. হীথ বঙ্গবন্ধুকে বলেন, স্বীকৃতিদানের আগে পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত আচরণবিধি (প্রটোকল) অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারকে দেখতে হবে, নতুন সরকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী কিনা। পরবর্তীকালে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কখন প্রত্যাহার করা হবে। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, তিনি (বঙ্গবন্ধু) যখনই চাইবেন, তখনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আরো বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি ভালো সম্পর্ক রাখতে চান, তবে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের কথাই ওঠে না।
৯ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ঢাকার পথে রওয়ানা হন।
১০ জানুয়ারি ১৯৭২ 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' এবং 'দি গার্ডিয়ান' বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। কারামুক্তির পর দেশে ফেরার আগে লন্ডনে এসে বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বলে প্রথমোক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ প্রধান এবং সর্বোত্তম ব্যাপার। এর ফলে বাংলাদেশের টিকে থাকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শেখ মুজিবই জানেন কী করে বাঙালির আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি এখন বাঙালিদের কাছে ফিরে গিয়েছেন।' এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে আরো বলা হয়, 'লন্ডনে পৌঁছানোর পর শেখ মুজিবকে শারীরিকভাবে সুস্থ এবং ধীর-গম্ভীর বলে মনে হয়েছে। তাঁর চারদিকে ছিল কর্তৃত্বের আভা। তিনি কাউকে ভীতি প্রদর্শন করেননি, কোনো আদর্শও তিনি বিসর্জন দেননি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, 'ক্যারিজম্যাটিক', উদারপন্থী, বিচক্ষণ এবং কিছুতেই অন্যের হাতের পুতুলে পরিণত হবেন না ইত্যাদি গুণের অধিকারী যে ব্যক্তিকে ইয়াহিয়া খান কারারুদ্ধ করেছিলেন, সেই একই রাজনীতিবিদ ফিরে এসেছেন বলে মনে হয়েছে।'
শেখ মুজিবকে সাফল্য অর্জনের সুযোগ দিতেই হবে। বাংলাদেশকে বৈদেশিক সাহায্য পেতেই হবে। রাষ্ট্র হিসেবে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বৈদেশিক সাহায্যের মতো অবশ্য প্রয়োজন। ব্রিটেন শিগগিরই স্বীকৃতি দান করবে। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত পুরনো আচরণবিধি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মাটিতে তাঁর পা রাখা মাত্রই এই নতুন রাষ্ট্র একটি বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই হবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের উপযুক্ত সময়।
(দি গার্ডিয়ান, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২)।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে ঢাকার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন : "পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, ভুট্টো, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে।"
১১ জানুয়ারি ১৯৭২ 'দি টাইমস'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটেছে এবং পূর্ব বাংলা বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে এবং নির্মম ও দীর্ঘস্থায়ী উৎপীড়নের মাধ্যমে যারা জনগণকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছে, তাদের কবল থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলে শেখ মুজিব যেদিন রেসকোর্স ময়দানে আবেগতাড়িত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, সেদিনই বাংলাদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের অবসান হয়।
(দি টাইমস, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)।

লেখক: ৭১-এ দাউদকান্দি মুজিববাহিনীর অধিনায়ক এবং সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক

পৌষ সংক্রান্তি উৎসব

ইসমত আরা পলি

পৌষ আগলানো বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মনে করা হয় পৌষ মাস শস্যের মাস। আর এমন মাসই যেন সারা বছর থাকে, তাই তাকে আগলে রাখা হয়। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত কথা 'পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস'কে সামনে রেখেই আয়োজিত হয় পৌষপার্বণ। নতুন ধান উঠে এই সময় তা কৃষকদের আঙিনা সাজিয়ে দেয়। মাটি নিকিয়ে দেওয়া গ্রাম বাংলার বহু ঘরের উঠোনে এই সময় ঢেঁকি সিঁদুরে রাঙানো হয়। তুলসী মন্দিরে আঁকা থাকে 'নেড়া নেড়ি'র ছবি। বাড়িতে সাড়ম্বরে তৈরি হয় পিঠেপুলি। চালের গুঁড়ি দিয়ে আঁকা হয় আল্পনা। আর চলে 'আউনি বাউনি'র ছড়া।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। ১২টি রাশি অনুযায়ী ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে। বাংলা পৌষ মাসের শেষ দিন পালন করা হয় মকর সংক্রান্তি। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এ সংক্রান্তিকে তিল্লা সংক্রান্তিও বলা হয়। একদিকে নতুন ধান উঠার আনন্দ। অন্যদিকে মকর রাশিতে সূর্যের আগমনকে কেন্দ্র করে দিনটি মকর সংক্রান্তি নামে পরিচিত। বছরের বারটি সংক্রান্তির মধ্যে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মকর সংক্রান্তি। এ সময় সূর্য দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে যায়। খাওয়া দাওয়া, ঘুড়ি উৎসবের পাশাপাশি পূণ্য স্নানের জন্যও মকর সংক্রান্তি গুরুত্বপূর্ণ। মকর সংক্রান্তিতে মূলত বসন্তকে আহ্বান জানানো হয়। এটা ফসল কাটার উৎসব হিসেবেও বিবেচিত হয়। ভোরের স্নান, সূর্য প্রণাম, পিঠা পুলি ও চিড়া মুড়ির নাড়ু, তিলের নাড়ু তিল্লা বাতাসা খাওয়া, ঘুড়ি উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে বাঙালিরা। পৌষের শেষ আর মাঘ মাসের শুরুতে যে সংক্রান্তি আসে তাই পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি। পৌষ মাস মল মাস বা অশুভ মাস হিসেবে চিহ্নিত হলেও শাস্ত্র মতে মকর সংক্রান্তি থেকেই শুরু হয় শুভক্ষণ। এই সময় সূর্য ধনু রাশি ত্যাগ করে মকর রাশিতে গমন করে।

শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ন তাই একে মকর সংক্রান্তি বলে। কেউ আবার এটাকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিও বলে। ছয়মাস থাকে উত্তরায়ন আর ছয় মাস থাকে দক্ষিণায়ন। পৌষের শেষ মুহূর্তের এই উৎসব সনাতন সংস্কৃতির এক প্রাসঙ্গিক বিষয়। পৌরাণিক মতে দেবতাদের দিন শুরু হয় উত্তরায়ণের সাথে সাথে। দক্ষিণায়নের সাথে সাথে শুরু হয় দেবতাদের রাত্রি। দীর্ঘ রাত্রি থেকে দেবতাদের দিনে প্রবেশ করার ক্ষণটিকে উৎসব আকারে পালন করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

তবে এ উৎসব পালন নিয়ে রয়েছে নানা মত। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস মতে মকর সংক্রান্তি যে উত্তরায়ণের সূচনা এবং এ উৎসব পালন করার মাধ্যমে অশুভ শক্তি নাশ হয়। পূরাণ অনুসারে মকর ক্রান্তির এই দিনে অসুরদের সাথে দেবতাদের যুদ্ধের অবসান ঘটে। ঐ দিন ভগবূ বিষ্ণু অসুরদের বধ করে তাদের ছিন্ন মুন্ড (মাথা) মন্দিরা পর্বতে পুঁতে দেন এবং শুভ শক্তির সূচনা করেন। মহাভারত ও কালিকাপুরাণ অনুসারে এই মকর সংক্রান্তিতে দেবতাদের আরাধনা করা হয়।

পৌষ সংক্রান্তি মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি ক্ষণ। 'মকর সংক্রান্তি' শব্দটি দিয়ে নিজ কক্ষপথ থেকে সূর্যের মকর রাশিতে

প্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী 'সংক্রান্তি' একটি সংস্কৃত শব্দ, এর দ্বারা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

সংক্রান্তি অর্থ সঞ্চার বা গমন করা। সূর্যের এক রাশি হতে অন্য রাশিতে সঞ্চার বা গমন করাকেও সংক্রান্তি বলা যায়। সংক্রান্তি শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও একই অর্থ পাওয়া যায়। সং+ক্রান্তি, সং অর্থ সঙ সাজা এবং ক্রান্তি অর্থ সংক্রমণ অর্থাৎ, ভিন্ন রূপে সেজে অন্যত্র সংক্রমিত হওয়া বা নতুন সাজে, নতুন রূপে অন্যত্র সঞ্চার হওয়া বা গমন করাকে বোঝায়। সূর্য এ দিনই ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। এর থেকেই মকর সংক্রান্তির উৎপত্তি।

যে কোনও উৎসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে মানুষের মিলনের আনন্দ বার্তা। আত্মীয়-পরিজনের আগমনে উৎসব পূর্ণতা লাভ করে। পৌষের সংক্রান্তির কথা উঠলেই ভেসে উঠে পিঠে, পুলি, পায়েস দিয়ে রসনাতৃপ্তি এবং ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সংক্রান্তির স্নান শেষে ধানের খেতে খড়ের বুড়ি মা-র ঘরে আগুন দিয়ে গ্রাম জুড়ে আট থেকে আশির শরীর উষ্ণ করার ছবি। এখানেই শেষ নয়, সবুজ শ্যামল গাঁয়ের বাড়ির বিরাট উঠোনে জায়া, জননীরা নানা রঙের আলপনা এঁকে ধান, দূর্বায় পূজো সারেন। ঘরের আসনে তিল-কদমায় ঠাকুর সেবা-সহ আরও নানা আয়োজন হয়ে থাকে পৌষ সংক্রান্তিতে। শুধু বাংলায় বাঙালিরাই নন, আমাদের দেশের নানা প্রান্তে এই দিনটিকে নানাভাবে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সঙ্গে পালন করা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি-তে মূলত নতুন ফসলের উৎসব 'পৌষ পার্বণ' উদযাপিত হয়। নতুন ধান, খেজুরের গুড় এবং পাটালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করা হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় চালের গুঁড়া, নারিকেল, দুধ আর খেজুরের গুড়। মকর সংক্রান্তি নতুন ফসলের উৎসব ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'উত্তরায়ণের সূচনা' হিসেবে পরিচিত। একে অশুভ সময়ের শেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, পঞ্জিকা মতে, জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়।

আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য এ সময় লক্ষ্মী দেবীর আরাধনাও করা হয়। মল মাসের অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষে এই উৎসব পালনের মাধ্যমে অশুভ শক্তির ত্যাগ আর শুভ শক্তির সূচনা করা হয়। আবার কোন কোন মতে এই দিনে সূর্যদেব তার পুত্র মকর রাশির অধিপতি শনির উপর রাগ প্রশমিত করে তার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই জন্য সূর্যদেবের কাছ থেকে আশির্বাদ পেতে সকালে সূর্যকে প্রণামের মধ্য দিয়ে মকর সংক্রান্তির উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

পৌষ সংক্রান্তি উৎসব মূলত বাঙালির ঘরে শস্যকে উদযাপন করার সমারোহ। পাকা ধান ঘরে তোলা উপলক্ষ্যে এই সময় একটি বিশেষ রীতি পালিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন বা তার আগের রাতে ২ থেকে ৩টি ধানের শিষ নিয়ে তার বিনুনি বাঁধা হয়। শহরের বুকে কেউ কেউ খড় দিয়েও বাঁধেন বিনুনি। এরপর তা ঘরের আসবাব বাকি অংশে বেঁধে দেওয়ার রীতি দেখা যায়। বাঁধার সময় বাজে শাঁখ আর ছড়া কাটা হয় 'আউনি-বাউনি কোথাও না যেও, তিন দিন ঘরে বসে পিঠে-পুলি খেও!'

পৌষ-পার্বণ মানেই বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠা উৎসবের ধুম। ভোজন রসিক বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে যেন মিশে আছে ভাপা, চিতই, পাকানসহ নানা পিঠার নাম। শীত শুরু থেকেই যেন পিঠার ধুম পরে গ্রামে গ্রামে। শহুরে জীবনে যেন অনেকটা অপরিচিত এই দৃশ্য। শুধু সকাল আর বিকালে শহরের মোড়ে মোড়ে বিক্রি করা হয় ভাপা পিঠা।

পৌষ পার্বণের দিন যত এগিয়ে আসে ততোই বেশি করে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মৃৎশিল্পীরা। এই উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ দিনাজপুরের মৃৎশিল্পীরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে মাটির সরা বানাতে মশগুল হয়ে পড়ে। এই পরিশ্রমের কাজটি নরম মাটিকে ছাঁচে ফেলে তৈরী করা হয় বিভিন্ন আকৃতির সরা। শুধু সরাই নয়, তার সাথে তৈরী করতে হয় উপযুক্ত ঢাকনাও, যাকে ঢাকন বলে। এরপর কাঁচা সরাগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে পাকা করে বিক্রি করা হয় খুচরো অথবা পাইকারি হিসাবে।

পৌষ সংক্রান্তি মানেই মায়ের হাতের তৈরি নানা রকমের পিঠা খাওয়া। দিনটিকে ঘিরে ঘরের গৃহবধূরা ব্যস্ত সময় পার করে। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে তারা তৈরি করে নানা বাহারি পিঠা। আর মায়ের হাতের তৈরি সুস্বাদু পিঠা খেয়ে সন্তান যখন আত্মহারা হয়, মাও যেন তার শত ক্লান্তি ভুলে যান। বছরের এমন দিন একবারের জন্য হলেও মায়ের কাছে ফিরে যাবার শৈশবকে মনে করিয়ে দেয়। বাঙালি ঐতিহ্য আর উৎসব পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠা-পুলির আয়োজন আনন্দের মাত্রাকে বেগবান করে তোলে। তাই উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পৌষ-সংক্রান্তিকে বরণ করে নিতে নানা আয়োজনে ব্যস্ত থাকে গৃহবধূরা। ঘরে ঘরে চলে নানা ধরনের ভিন্ন ভিন্ন নামের পিঠা তৈরির ধুম।

পৌষ সংক্রান্তিতে দেশের অনেক জায়গায় ঘুড়ি ওড়ানো হয়। বিশেষ করে রাজধানীর পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্থানে। যা সাকরাইন উৎসব নামে পরিচিত। এই উৎসবকে মাথায় রেখে টানা এক সপ্তাহ পুরান ঢাকার অধিকাংশ গলিতে আর খোলা ছাদে থাকে সুতা মাঞ্জা দেওয়ার ধুম।

পৌষ সংক্রান্তির দিনই পালিত হয় পুরান ঢাকার এবং আদি ঢাকাইয়াদের ঐতিহ্যের সাকরাইন উৎসব। প্রজাপতি, পক্ষিরাজ, চুড়িদার, গাহেলদার, কাউঠাদার, চোখদার, চাঁনদার, ঘর গুড্ডি, বাক্স গুড্ডি, কয়রা ইত্যাদি নানারকমের ঘুড়ি উড়ানো; প্লাকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শনী এবং সাজানো ঘোড়ার গাড়ীতে অলি-গলি ঘুড়ে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে পুরান ঢাকার মানুষের পৌষ সংক্রান্তি উৎসব উদযাপিত হয়। ভোরবেলা কুয়াশার আবছায়াতেই ছাদে ছাদে শুরু হয় ঘুড়ি ওড়ানোর উন্মাদনা। ছোট বড় সকলের অংশগ্রহণে মুখরিত ছিল প্রতিটি ছাদ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে উৎসবের জৌলুস। আর শীতের বিকেলে ঘুড়ির কাটাকাটি খেলায় উত্তাপ ছড়িয়েছে

সাকরাইন। এক দশক আগেও ছাদে ছাদে থাকতো মাইকের আধিপত্য। আজ মাইকের স্থান দখল করেছে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম। উৎসবের আমেজ পুরান ঢাকার সর্বত্র। গেন্ডারিয়া, তাঁতিবাজার, লক্ষ্মীবাজার, চকবাজার, লালবাগ, সূত্রাপুর মেতেছিল ঐতিহ্যের উৎসবে। আকাশে উড়েছে ঘুড়ি আর বাতাসে দোলা জাগিয়েছে গান। মাঝে মাঝে ঘুড়ি কেটে গেলে পরাজিত ঘুড়ির উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হয়েছে ভোকাট্টা লোট শব্দ যুগল। সাকরাইনে পুরান ঢাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে জামাইদের নাটাই, বাহারি ঘুড়ি উপহার দেয়া এবং পিঠার ডালা পাঠানো ছিল অবশ্য পালনীয় অঙ্গ। ডালা হিসেবে আসা ঘুড়ি, পিঠা আর অন্যান্য খাবার বিলি করা হত আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়ার লোকদের মধ্যে। নীরব প্রতিযোগিতা চলত কার শ্বশুরবাড়ি হতে কত বড় ডালা এসেছে। আজ এই সব চমৎকার আচারগুলো বিলুপ্ত হতে চলেছে। পুরান ঢাকার আদি বসবাসকারী সকল মানুষ এই ঐতিহ্যগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেন। নতুন প্রজন্মকে শোনান সেই সব মুখরিত দিনের কথা। মনের খুব গভীরে পরম মমতায় লালন করেন ঐতিহ্যের পরম্পরা। স্বপ্ন দেখেন এই সকল প্রাণময় ঐতিহ্যগুলো আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। সন্ধ্যায় আধার ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরান ঢাকা সকল জঞ্জাল আর কালিমা পুড়িয়ে ফেলার আর আতশবাজির খেলায় মেতেছিল। রাতে কেউ কেউ উড়িয়েছে ফানুস। সাকরাইন এমনই সুন্দর আর অর্থপূর্ণ ঘুড়ি উড়ানোর উৎসব। ঢাকায় এই উৎসব হচ্ছে প্রায় ৪০০ বছর ধরে। পুরানো ঢাকায় ঘুড়ি ওড়ানো বিনোদন শুরু হয়েছিল মুঘল আমলে। কথিত আছে ১৭৪০ সালে নবাব নাজিম মহম্মদ খাঁ এই ঘুড়ি উৎসবের সূচনা করেন। সেই থেকে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই ঘুড়ি উৎসব পশ্চিম ভারতের গুজরাটেও পালিত হয়। সেখানে মানুষ সুন্দর সুন্দর ঘুড়ির মাধ্যমে সূর্যদেবতার কাছে নিজেদের ইচ্ছা ও আকুতি প্রেরণ করেন। উত্তর ভারতীয় এ ঘুড়ি উৎসবটিকেও স্থানীয়রা 'সাকরাইন' নামে অভিহিত করে।

মেলা শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হরেক রকমের খেলনা, নানা ধরণের বাঁশির কান ফাটানো শব্দ আর হাজারো মানুষের কলরব। নামে মাছের মেলা হলেও এ মেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে এ মেলার বাতাসে ছড়িয়ে পড়া হাজারো মাছের আঁশটে ঘ্রাণ আপনাকে নিশ্চিত করবে যে মেলাটি মাছের। মাছকে উপলক্ষ করে জমে ওঠা এসব বিশাল মেলা জুড়ে থাকে গরম জিলাপি, ঝোল মাংসের ধোঁয়া ওড়া তরকারি আর পরোটা, ডিম ভুনা, তিলুয়া-বাতাসা, খই-মুড়িসহ নানা রকম মৌসুমী ফল, শিশুদের খেলনা, কিশোরী-তরুণীর প্রসাধনী, কাপড়চোপড়, বাঁশ-বেত আর কাঠের আসবাব, ঘর-সংসারের নানা রকম মাটির বাসন, কাঠের জিনিস, লোহালক্কড়ের সামগ্রী। আরও থাকে নাগরদোলা, বায়োস্কোপসহ হরেক রকম চোখ ধাঁধানো পণ্য।

কায়েতপাড়ায় বংশী নদীর তীরে মেলা বসেছে। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বসা এ মেলার নাম 'বুড়াবুড়ির মেলা।' মেলায় কিন্তু শুধু বুড়াবুড়ি নেই, আছেন নানা বয়সী মানুষ। এ মেলার নাম বুড়াবুড়ির মেলা হলো কীভাবে? বনবিবি সুন্দরবনের মানুষদের কাছে অতিপরিচিত এক নাম। নৌকার মাঝিরা যেমন নৌকা ছাড়ার আগে 'বদর, বদর' ডেকে উঠে নিজেদের যাত্রাকে শুভ করতে চান, তেমনি সুন্দরবনের মধু ও মোম আহরণকারী, কাঠুরে ও মৎস্যজীবীরা বনে ঢোকার আগে বনবিবির নামে দোয়া চেয়ে নেন। লোকায়ত বিশ্বাস, বনবিবি বাঘের হাত থেকে বনজীবীদের রক্ষা করেন। কথিত আছে যে বনবিবি ও তাঁর ভাই আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন। তখন তাঁদের পরনে ছিল এক বিশেষ টুপি। অনেকে বিশ্বাস করেন, বনবিবি আঠারো ভাটির দেশ ভারতবর্ষে এসেছিলেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে। তারপর, সুন্দরবনে এসে অত্যাচারী রাজা দক্ষিণ রায়কে পরাভূত করে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। পঞ্জিকামতে পৌষ সংক্রান্তিতে তাদের নিয়ে প্রতিবছর পূজা অর্চনা করা হয়। কায়েতপাড়ার মন্দিরের পুরোহিত উত্তম ঠাকুর বলেন, 'বনবিবি বা বনদুর্গা নাম থেকেই কালের আবর্তনে বর্তমান সময়ে এর নাম এসেছে বুড়াবুড়ি দেবির পূজা। চারশ বছর থেকেই এই বুড়াবুড়ির পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বলে জানা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় ধামরাইয়ের এ মেলা চলে।'

প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে মৌলভীবাজারের শেরপুরে কুশিয়ারা নদীর তীরে প্রায় ২০০ বছর আগে থেকে চলে আসছে মাছের মেলা। হাজার মানুষের পদচারণায় মুখরিত জনপথ। চারপাশের ডালায় সাজানো অগণিত নানা জাতের মাছ শীতের মিঠেকড়া রোদে চকচক করছে। এখানে শুধু মাছ কিনতে সবাই আসেনি। অনেকে এসেছে মাছ দেখতেও। গাজীপুরের এই মেলাটিকে মাছ মেলাও বলা হয়ে থাকে। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বিনিরাইল গ্রামে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হত খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে। অগ্রহায়ণের ধান কাটা শেষে পৌষ-সংক্রান্তি ও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। স্থানীয়রা প্রায় ২৫০ বছর ধরে মেলার আয়োজন করে আসছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ মেলাটি একটি সার্বজনীন উৎসবে রূপ নিয়েছে।

এছাড়া নওগাঁর রানীনগরে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বয়লাগাড়ি গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় প্রথম দিন মূল আকর্ষণ 'মাছ'। মেলায় বড় বড় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ওঠে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে মাছ কেনাবেচা। জামাইসহ প্রতিটি বাড়িতে সাধ্যমতো কেনা হয় মাছ। আর হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গণ যেন মিলন মেলায় পরিণত হয়ে উঠে। মেলার দ্বিতীয় দিন শনিবার 'বউ মেলা' হয়ে এ মেলা শেষ হয়। আর রাজধানীর সংস্কৃতিকর্মীরা আয়োজন করে বাংলার শাশ্বত পৌষ মেলার। মেলায় পিঠা-পুলির স্টল বসে। চোখের সামনেই চলে পিঠা তৈরি ও বিক্রি। একই সময় লোক আয়োজন থাকে অনুষ্ঠান মঞ্চে। মঞ্চ থেকে জারি, সারি, ভাটিয়ালী গানে তুলে ধরে লোকায়ত সংস্কৃতি। পুঁথি পাঠ, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে প্রজন্মকে আহ্বান জানানো হয় মাটির কাছাকাছি আসার।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শীতের গ্রামবাংলা

মঈনুল হক চৌধুরী

বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। ষড়ঋতুর আনাগোনায় আমাদের গ্রামবাংলার জনজীবন হয়ে ওঠে রঙিন। গ্রামবাংলার বুকে ষড়ঋতু নেমে আসে রূপ রস, বর্ণ-গন্ধ ও ছন্দে। ষড়ঋতু নানা রঙের জাল বিস্তার করে আমাদের সবার মনে। তাই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুর চাকায় চেপে ঘুরে ফিরে আসে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার বুকে। মনে কি কখনো প্রশ্ন জাগে? শীতের কি কোনো দেশ আছে? ঘরবাড়ি? যদি থাকে, কোথায় সে দেশ, কিংবা বাড়ি? আসলে ষড়ঋতুর পালা বদলে শীত আসে অতিথি হয়ে। তার ঠিকানা জানি না আমরা, চিনি না তার ঘরবাড়ি। কিন্তু এই শীত প্রতিবছর বেড়াতে আসে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে। আসে হিমালয় পর্বত থেকে। হেমন্তের সোনালী ডানায় ভর করে আসে সে। আসে হিমেল হাওয়া সাথে নিয়ে। আসে কুয়াশার রহস্যময় চাদর জড়িয়ে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে অন্যরকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয় শীত ঋতু। আমরা তার রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। শীতের হাওয়ায় লাগলো কাঁপন' কেবল কবিতার কথা নয়। গ্রাম বাংলায় শীত এলে নদী-নিসর্গ, শ্যামল-শোভায় প্রকৃতিতে শীতের আমেজ লাগে। বন-বাগানে, বিলে-জলাশয়ে, পাখ-পাখালির পাখায় পাখায় শীতের আগমনী আনন্দ দেখা দেয়। তাই শীত বাংলাদেশের প্রকৃতিতে এক প্রধান ও রোমাঞ্চকর ঋতু। শীতের আমেজটা অন্যান্য ঋতুর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মধ্যে এসময় প্রকৃতিতে বইতে থাকে উত্তরে হাওয়া। সবুজ ঘাসের ওপর জমে থাকা মুক্তোর মতো ঝকমকে শিশির বিন্দু। সে সাথে টাপুর টুপুর শব্দে কুয়াশার পানি পাতার ওপর পড়ার শব্দ। তাছাড়া কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে ডিমের লাল কুসুমের মতো সূর্যটা যখন ঠিক মাথার ওপর ওঠে, তখন কি যে আনন্দ লাগে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা লেপের তলা থেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে সোনালী রোদে পিঠ পেতে বসে। তখন নরম গরম রোদের মিঠেকড়া স্পর্শে শীত পালিয়ে যেতে থাকে। এ সময় রোদের তেজ বেড়ে যায়। কুয়াশা যায় কেটে। সবুজ ঘাসের ডগায় জমা রাশি রাশি শিশির বিন্দু পালিয়ে যায়। এ সময় মাঠে মাঠে কৃষকেরা কাজ করে। দূরে ছোট নদীতে পাল তুলে নৌকা চলে যায়। নদীর দু'পাশে ফসলের বিপুল সমারোহ। শীতকালের একটি বিশেষ আকর্ষণ খেজুরের রস। সারারাত ধরে হাঁড়িতে টুপ টুপ করে পড়তে থাকে রস। খুব ভোরে নামানো হয় রস ভর্তি রসের হাড়ি। এই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় গুড়। কি মনমাতানো গন্ধ সেই গুড়ের। এই গুড় দিয়ে তৈরি হয় নানারকম পিঠে পুলি। এসব পিঠার ধরণ আলাদা, আকর্ষণও ভিন্ন। এই পিঠার সাথে একাত্ম হয় বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্য। ভাপা, সাজ, খেজুরি, দুধকমল, ছিট, কাটা, লবঙ্গ লতিকা, আরো কত বিচিত্র নাম যে আছে, বলে শেষ করা যাবে না।

সত্যিকারে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যকে, ঐতিহ্যের প্রধান চিত্রকে যদি উপলব্ধি করতে হয়, তবে এসব কিছু দেখতে হবে খুব কাছ থেকে। যেতে হবে গ্রামে। সেখানে দেখা যাবে নবান্নের এই দেশে এই সময়ে মানুষ কত আনন্দমুখর। কতো পরিতৃপ্ত। আমাদের লোকজ সংস্কৃতি মিশে আছে এই শীতের মনোরম নবান্ন উৎসবকে ঘিরে। যেখানে ধানের সাথে মানুষের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। গ্রামের সবাই স্বাগত জানায় এই নবান্নকে। কত ধরনের আনন্দের মহড়া। মুর্শিদী, কীর্তন, আরো কতো কী! রাতে গানের আসর বসে। হয়তো সেই গানের সুর নেই। কণ্ঠ ভাঙা। তবু দরদ দিয়ে গেয়ে যায়

তারা। সেই গানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তাদের হৃদয়ের লুকানো সুখ দুঃখের কতো না কথা। ষড়ঋতুর প্রভাবে আমাদের মন হয়ে ওঠে রঙিন। আমাদের মাতৃভুমি বাংলাদেশ নানা রকম মেলার জন্য বিখ্যাত। ষড়ঋতুর বিভিন্ন সময়ে এখানে বেশ উৎসবের সাথেই এ মেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলার রকমারী আয়োজন গ্রাম বাংলার বড় থেকে ছোটদের মনকে আলোড়িত করে। তার মধ্যে গ্রামবাংলার শীতকালীন মেলা অন্যতম। সাধারণভাবে এদেশের মেলায় থাকে কুটিরজাত পণ্য দ্রব্য। সেই সাথে খাবার জিনিসও প্রয়োজন হয় প্রতিদিনকার জীবনে। ফলে মেলা থেকেই সেসবের প্রয়োজন মেটায় অজপাড়াগায়ের মানুষজন। কামার, কুমার, তাঁতী, ছুতোর, চাষী সবারই মেলায় পরিণত হয় এসব মেলা। বেশিরভাগ শীতকালীন মেলাই বসে নদীর ধারে মাঠে কিংবা ফসলকাটা মাঠে। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যখানে বটগাছের নিচেও মেলার আয়োজন করে থাকে স্থানীয় লোকজন।

এসব মেলাকে ঘিরে ঘরে ঘরে নীরবে প্রস্তুতি চলে প্রায় সারাবছর ধরে। গ্রাম্যকূলবধু কৃষাণীরা ঘরের মুঠোচাল জমা করে কিংবা গৃহস্থালীর নানা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে মেলাকে উপলক্ষ্য করে টাকা পয়সা জমিয়ে রাখে। তারপর মেলা শুরু হলে মেলা থেকে পছন্দসই জিনিস কিনে নিজেকে ও নিজের ঘর সংসার সাজায়। কুটিরজাত জিনিসের মধ্যে এসব মেলায় থাকে বাঁশ, কাঠ, আর বেতের নানান সামগ্রি। ঘর সাজাবার উপকরণ যেমন পাটের শিকে, শোলা আর তৈরি খেলনাও থাকে এসব মেলায়। মাটির হাড়ি পাতিল, খেলনাপুতুল তো আছেই। কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় জিনিস কাস্তে, নিড়েন, দা, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে পসরা সাজান কামার। তাঁতী নিয়ে আনেন হাতে বোনা শাড়ী, লুঙি ইত্যাদি। হাল আমলের প্রায় শীতকালীন মেলাতেই মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, চুড়ি-পুতির মালা, আয়না, চিরুনী ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যায়। হরেক রকমের মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য - যেমন- গুড়ের জিলাপী, বাতাসা, মুদকী, মশলাযুক্ত পান এসব মেলায় আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই বহুবিচিত্র পণ্যের পাশে এসব মেলায় চমক লাগায় স্থানীয় কিছু জিনিস। যেমন নকশী কাঁথা। তাছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেটের বিভিন্ন মেলায় আদীবাসীদের হাতে তৈরি নানা রকম পণ্যও পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো শীতকালীন মেলায় পুতুল নাচ, যাত্রা অভিনয় ও নাগোরদোলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই শীতে আসে শীতের পাখিরা। দূরদূরান্ত থেকে তারা আসে অতিথির বেশে। এসব পাখি সাইবেরিয়া কিংবা যে কোনো শীতের

রাজ্য থেকে এসে থেকে যায় পুরো শীতের মৌসুম। আমাদের গ্রাম বাংলার সৌন্দর্যকে এরা বাড়িয়ে দেয় বহুগুন। এই পাখিরা কোলাহলে মূখরিত করে রাখে সারাদেশ। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে তারা। দেশীয় পাখিরা গ্রহণ করে তাদের বন্ধুর মত। কেউ ডুব দিয়ে শামুক খোঁজে, কেউ বা আবার ভেসে বেড়ায় দীঘির জলে। কেউ হয়তো শীতের মিষ্টি রোদে ডানা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে এক নয়ন জুড়ানো দৃশ্য। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রায় দেড়শ প্রজাতির শীতের পাখি চলে আসে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ পাখির আবাসস্থল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এসময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকগুলো অতিথি পাখির কলকাকলীতে মূখরিত হয়। এরপর শীতের পাখিরা ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। শীত শেষ হলে আবার উড়াল দেবে নিজ বাসভূম অভিমূখে। তাইতো এদের বলা হয় শীতের পাখি।

এসময় আমাদের গ্রাম বাংলায় প্রচুর ফলের সমারোহ ঘটে। ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কুল, পেঁপে, ও কমলালেবু। পাকা পেঁপে বেশ সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ফল। এতে প্রচুর ভিটামিন আছে। শীত এলে নানা রঙের মৌসুমী ফুল আমাদের বাগানকে আলোকিত করে রাখে। এসব ফুলের রূপজৌলুস খুবই নজরকাড়া। এদের কত যে রঙ আর কত আকুতি তার হিসেব দেওয়া কঠিন। আমাদের দেশে শীত মৌসুমেই এ ধরনের কিছু কিছু ফুলের চাষ হয়। দিন দিন আমাদের মৌসুমী ফুলের তালিকা বেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রতিবছর কিছু না কিছু নতুন ফুল আসছে এখানে। মৌসুমী ফুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফুলগুলো হলো -গাঁদা, গোলাপ, ডালিয়া, সূর্যমুখী, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুল। এই শীতের অপূর্ব শোভার মাঝেই বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রকৃত রূপ অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য ঋতুর বেলায় যে উদ্দামতা, শীতের বেলায় তা অনুপস্থিত। শীতকালে দিন ছোট থাকে। কেমন করে যে সকাল থেকে দুপুর আর দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়, তা যেন খোঁজই পাওয়া যায় না। গ্রামে মুক্ত মাঠে চলার পথে মটরশুঁটি যেন দু'পা জড়িয়ে ধরে আদর জানায়। সবুজ ঘাসের ওপর মুক্তোর মতো ঝকমকে শিশির হাতছানি দেয়। গাছের পাতাগুলো ধীরে ধীরে হলুদ হতে থাকে। হলুদ হতে হতে একসময় ঝরে যায়। তাই ছয়টি ঋতুর মধ্যে শীত ঋতুটা একদমই আলাদা। শীত আমাদের অনেকেরই প্রিয় ঋতু। অনেকেই অপেক্ষা করে শীত ঋতুর জন্য। শীত আসে প্রকৃতিকে বদল করে দিতে। শীত আসে নতুন করে গ্রাম বাংলাকে সাজিয়ে দিতে। তাই শীতের অপরূপ সৌন্দর্য ভোলা যায় না।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

শুচি

কেতন শেখ

- আপনার নামটা কি যেন বলেছিলেন ?
- আমার নাম আবদুল মজিদ খান। আপনি আমাকে মজিদ বা মজিদ সাহেব বলে ডাকতে পারেন।

মাহবুব ঘড়ি দেখলো। পাঁচটা পয়ত্রিশ। সাড়ে পাঁচটায় ওর চেম্বার থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা। আবদুল মজিদ খানের কারণে সাড়ে পাঁচটায় বের হওয়া সম্ভব হয়নি। ভদ্রলোক চেম্বারে এসেছেন দেরি করে। তাঁর আসার কথা পাঁচটায়। আগের মক্কেলকে দ্রুত বিদায় করে মাহবুব পাঁচটা থেকে আবদুল মজিদ খানের অপেক্ষায় বসে আছে। এই ভদ্রলোককে সময় না দিয়ে উপায় নেই। স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী তাঁর তদবীর পাঠিয়েছেন।

- আপনার পাঁচটায় আসার কথা। আপনি দেরি করেছেন। সাড়ে পাঁচটায় আমার এক জায়গায় যাওয়ার জন্য রওনা দেয়ার পরিকল্পনা ছিলো।
- বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত নই। রাস্তাঘাটে বিলম্ব হতেই পারে। এসব অনিশ্চয়তার বা ভুলভ্রান্তির দায়িত্ব আমার না। তাই সময়মতো সব কিছু করার প্রত্যাশা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।
- জি, সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একই রাস্তাঘাটে আমাকেও চলাফেরা করতে হয়। সময়মতো রওনা না হলে আমিও আমার গন্তব্যে সময়মতো পৌঁছাতো পারবো না। সেটাও আমার মক্কেলকে বুঝতে হবে, তাই না ?
- সেটা আমার বিবেচ্য বিষয় না। আমাকে বলা হয়েছে যে পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত আপনার এক ঘন্টা আমার। আপনার ফিস সেভাবেই দেয়া হয়েছে। আমি এক ঘন্টার রেটে আপনার সময় এবং কর্মসেবা কিনেছি। আমার আলাপ আলোচনা আমি ছয়টার মধ্যে শেষ করবো। ছয়টার পরে আপনি যেখানে খুশি সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা দিতে পারেন।
- জি, সেটা বুঝতে পেরেছি।

আবদুল মজিদ খান একটু নড়েচড়ে বসলেন। এরপর নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললেন, ছয়টার মধ্যে যা আলাপ হবে, সেটার ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত নেবো যে আপনাকে আমি আমার আইনী কাজকর্মের জন্য আরও টাকাপয়সা দেবো কি না। সেটাতে আপনার আপত্তি থাকলে এখনই বলেন। এই শহরে কাক, কবি আর উকিলের কমতি নেই।

মাহবুব প্রথমবারের মতো দৃষ্টি তুলে মনযোগ দিয়ে ভদ্রলোককে দেখলো। কেতাদুরস্ত পরিপাটি চেহারা, কলপ দেয়া কুচকুচে কালো চুল, দাড়িগোঁফহীন তামাটে বর্ণের মুখশ্রী, চোখে পাতলা ফ্রেমের চশমা, পরণে কালো রঙের স্যুট, গোলাপী শার্ট আর কালো টাই। প্রথম দর্শনে বয়স ধরা পড়ে না, তবু মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের বয়স

ষাট পার হয়েছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসার ভঙ্গিতে কোনো জড়তা নেই। কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় ঔদ্ধত্য, যা আত্মবিশ্বাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই ধরণের মানুষকে এতো সহজে মজিদ বা মজিদ সাহেব নামে সম্বোধন করা যায় না। তবু এরা নিজেদেরকে এভাবে ডাকতে বলে সামনের মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এই বিভ্রান্তি তাদের বিমলানন্দের উৎস। সামনের মানুষটা তখন নিজের তাগিদেই স্যার স্যার শুরু করে। মাহবুব অবশ্য সেটা করলো না। এমন মানুষকে কোনো নামেই সম্বোধন করার প্রয়োজন নেই। বাংলা ভাষায় সম্বোধনহীন কথোপকথনের চল আছে। আর মক্কেল হিসেবেও এরা কিছুটা বিপদজনক। এতো আত্মবিশ্বাসী বা দাম্ভিক মক্কেল উকিলকে দাবিয়ে চলে। উকিলকে দাবিয়ে চলা মক্কেল কোনো উকিলের স্বস্তির কারণ হন না।

কৃষিমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই ভদ্রলোকের তদবীর এসেছে আজকে দুপুর তিনটায়। মক্কেলের ব্যাপারে খোঁজখবর না করে মাহবুব কখনোই প্রাথমিক আলাপ করে না। মামলা নিয়ে পরবর্তী আলোচনা বা আদালত পর্যন্ত যাওয়া তো অনেক দূরের কথা। আইনী পেশায় মক্কেলের খোঁজখবর না করে এক পা আগানোও বিপদজনক। ভুল মক্কেলকে সঠিক আইনী উপদেশ দিয়েও অনেক উকিলের সর্বস্ব গেছে। মক্কেল আর উকিলের সত্যমিথ্যার খেলা চলে আজীবন। চরম সত্য গোপন করে উকিলকে উজবুক বানিয়ে মক্কেল কেইস জিতে নেয়। পরে সর্বোচ্চ আদালতে আইনী বিপদে পড়ে উকিল। আর বিবেকের কথা তো বাদই। মাহবুব এসব কোনো প্যাঁচেই পড়তে চায় না।

আবদুল মজিদ খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মাহবুব দৃষ্টি নামিয়ে নিলো। ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি ছয়টা পর্যন্তই আপনার সাথে আলাপ করবো। বলেন, কি আলাপ করতে চান।

- সম্বোধনহীন আলাপচারিতা আমার অপছন্দ। তবে আপনি মনে হয় সেটাই করতে চান। করেন। আমি আপনাকে কি বলে সম্বোধন করবো, সেটা বলে দেন।
- আমার নাম মাহবুব। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতে পারেন।
- আচ্ছা, বুঝলাম। কাজকর্মের সময় মোবাইল ব্যবহার করা আমার অপছন্দ।
- অপছন্দ হলে মোবাইল ব্যবহার করবেন না। আমি চেম্বারে মক্কেলের সাথে আলাপ করার সময় মোবাইল ব্যবহার করি না। আমার মোবাইল ড্রয়ারে আছে। আমার হাতে বা টেবিলের উপরে নেই।
- ভালো। আপনার কথাবার্তা স্বচ্ছ। স্বচ্ছ কথাবার্তার লোকজন আমার পছন্দ।

মাহবুবের অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। চেম্বারে এয়ারকুলার থাকলেও ওর গরম লাগছে। মনে হচ্ছে ঘাড়ে হাত দিলে ঘাম টের পাওয়া যাবে। প্রভাবশালী বা দাম্ভিক আচরণের মক্কেলের সাথে চেম্বারে আইনী আলাপ করা মাহবুবের জন্য নতুন কোনো অভিজ্ঞতা না। কিন্তু আবদুল মজিদ খানের দৃষ্টি এবং ভাবভঙ্গিতে একটা বাড়তি অস্বস্তির প্রভাব আছে। তিনি রুমাল বের করে চশমা মুছলেন। এরপর চশমা চোখে দিয়ে গম্ভীর স্বরে কথা শুরু করলেন।

- আমার আগমনের হেতু একটা সমস্যা নিয়ে, যেই সমস্যার আইনী সমাধান প্রয়োজন। সমস্যা আমার কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানকে নিয়ে। তার নাম শুচিতা খান। তার বয়স একুশ। আমি তাকে আদর করে শুচি নামে ডাকি। শুচির মস্তিষ্ক বিকৃতি আছে। ছোটবেলা থেকেই তার আচরণ স্বাভাবিক না। সেটার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখনও চিকিৎসা চলছে। সেই সর্বোচ্চমানের চিকিৎসা চলতে থাকলে শুচি একদিন সুস্থ হয়েও যাবে। পুরোপুরি সুস্থ না হলেও বিকল্প ব্যবস্থা আছে। শুচিকে নিয়ে আমার সমস্যা অন্য জায়গায়। সেই ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। সমস্যা এবং কি সহযোগিতা আমার প্রয়োজন, দুটাই আমি বলবো।
- বলেন... অন্য জায়গায় কি সমস্যা সেটা আগে বলেন। সেটা শুনে আমি বলতে পারবো যে আমি সহযোগিতা করতে পারবো কি না, এবং কি ধরণের সহযোগিতা আমি করতে পারবো।

আবদুল মজিদ খান চায়ে চুমুক দিলেন। এরপর বিরক্ত স্বরে বললেন, বলবো। আমি কথা বলতেই এসেছি। আমার কথা শেষ হলে আপনি কথা বলবেন। কখন বলবেন সেটা আমি বলে দেবো। শুধুমাত্র আলাপচারিতার কারণে মাঝখানে কথা বলবেন না।

- জি, বলবো না।

মাহবুবও চায়ে চুমুক দিলেন। সন্ধ্যেবেলার চা... সারাদিনের ক্লান্তি ছাপিয়ে শরীরে ঢুকে খিদের জানান দিচ্ছে। আবদুল মজিদ খানের কণ্ঠস্বরে অবশ্য ক্লান্তির কোনো রেশ নেই। মনে হচ্ছে তিনি কি বলবেন এবং কিভাবে বলবেন সেটার পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। মাহবুব আড়চোখে ঘড়ি দেখলো। ছয়টা বাজতে ষোলো মিনিট বাকি। ষোলো মিনিটে এই ভদ্রলোক কতোটুকু বলবেন আর মাহবুবের কি কথা শুনবেন সেটা বলা মুশকিল। কিন্তু এই ষোলো মিনিট পর্যন্ত তাঁর এই উদ্ধত আচরণ সহ্য করতেই হবে। গল্পের শুরুটা শুনে মনে হচ্ছে না এই কেইসে মাহবুবের করার কিছু আছে। আবদুল মজিদ খান চায়ে তৃতীয় চুমুক দিয়ে আবার কথা শুরু করলেন।

- শুচিতার মানসিক বিকৃতি শুরু হয় ২০০৭ সালে। তখন তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। সে তখন পরিবারের সবাইকে আমার পিতার ব্যাপারে অদ্ভুত কিছু মনগড়া কথা বলতো। সেসব কথার কোনোটাই সত্য না। আমার পিতা তখন জীবিত, কিন্তু তিনি তখন ডিমেনশিয়ার রোগী। কাউকে চেনেন না, কারও সাথে কথাবার্তাও বলেন না। শুচিতা তার দাদা-দাদীর আদর বা সান্নিধ্য পায়নি। কিন্তু সে এমন সব গল্প বলতো যে আমরা শুনে হকচকিয়ে যেতাম। সেসব গল্প ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার। আমার নিজের বয়সই তখন চৌদ্দ-পনেরো। ঐ সময়ের কথা আমারই ঠিকমতো মনে নেই। সন্তানদের সাথে আমার মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কোনো গল্প কখনও করা হয়নি। আমার পরিবারের

অন্য কেউও তাকে ঐ ধরণের কোনো গল্প বলেনি। আমাদের ঘরে মুক্তিযুদ্ধের তেমন কোনো বইও নেই। আর থাকলেও পাঁচ বছরের শিশুর সেই বই পড়ে এতো গুছিয়ে গল্প বানিয়ে বলার কথা না। কিন্তু শুচি অনেক গুছিয়ে সেসব গল্প বলতো। আমরা তখন তাকে ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার বললেন অবজারভেশনে রাখতে হবে, আর শুচিকে বলতে হবে যে এসব কোনোটাই সত্য না। আরও বললেন যে শুচি এসব গল্প বলা শুরু করলেই যেন তাকে থামিয়ে দেয়া হয়।

- গল্পগুলো কি ছিলো ?

আবদুল মজিদ খান রুক্ষ স্বরে বললেন, আপনাকে আমি অনুরোধ করেছি, আমার কথার মাঝখানে কথা বলবেন না। আমি আমার কথা শেষ করে এরপর আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেবো। আমার কথার মাঝখানে প্রশ্ন করে আমার ফ্লো থামাবেন না।

মাহবুব খুব সহজ কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললো, দুঃখিত, সেভাবে এই আলাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি আপনার মনোবিজ্ঞানী বা কাউন্সিলর নই যে আপনি পুরো গল্প বলবেন আর আমি চুপচাপ আপনার কথা শুনবো আর নোট নেবো। আমাদের এই কথোপকথন রেকর্ডও হচ্ছে না যে আমি পরে শুনে এটা সেটা বের করবো বা কেইস বুঝবো। এই আলাপ আমাদের প্রাথমিক তথ্য বিনিময়। আপনার এখনকার দেয়া তথ্যের গোপনীয়তা রাখা আমার নীতি। কিন্তু সেই তথ্যের সম্পূর্ণতার কারণে আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে এবং আমার পেশাগত নীতি বলে যে, কখন কি প্রশ্ন করা হবে সেটার সিদ্ধান্ত আমিই নেবো।

- ওহ, আচ্ছা। ভালো। নীতি থাকা ভালো।

মাহবুব আগের মতোই শান্ত ভঙ্গিতে বললো, আমি যখন প্রশ্ন করবো, তখন আপনাকে সেই প্রশ্নের উত্তরও দিতে হবে। সেই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি বাকি কথা শুনতে রাজি নই। কারণ প্রাথমিক তথ্য বিনিময়ে আমার পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রয়োজন। এখন আপনি বলেন, শুচিতা তার দাদাকে নিয়ে কি গল্প করতো ?

আবদুল মজিদ খান কিছুক্ষণ চুপ থেকে গম্ভীর স্বরে বললেন, শুচি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব গল্প বলতো, সেগুলোর কোনোটাই সত্য ছিলো না। সেগুলোর সাথে আমার এখনকার আইনী সহযোগিতার প্রয়োজনের কোনো সম্পর্কও নেই। মিথ্যে, মনগড়া এবং অপ্রাসঙ্গিক সেসব গল্প বলে আমাদের সময় নষ্ট হতে পারে। হয়তো আপনি বিভ্রান্তও হতে পারেন। সেই বিভ্রান্তির কি আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে ?

- আমি বিভ্রান্তি বা কালক্ষেপণ নিয়ে চিন্তিত নই। কেইসের প্রয়োজনে আমি ছয়টার পরেও এই আলাপ চালিয়ে যেতে পারি। আমার ধারণা সেসব গল্পের ডিটেইলস আপনার আইনী প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। আমার ধারণা সঠিক নাকি ভুল সেটা জানার জন্য আমাকে গল্পগুলো জানতে হবে।

কামরায় অস্বস্তিকর নীরবতা। দেয়ালঘড়ির কয়েক সেকেন্ডের টিকটিক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। এয়ারকুলার বা কামরার দুজনের কারোরই নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সাময়িক সেই নীরবতা ভাঙলেন আবদুল মজিদ খান। শুকনো কাঁপা স্বরে বললেন, আমাদের আদিবাড়ি সিরাজগঞ্জের ঝাঐল গ্রামে। আমার পিতা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৮০ সালে আমরা সপরিবারে ঢাকায় চলে আসি। কিন্তু ঝাঐল গ্রামে এখনও আমাদের পরিবারের সুনাম আছে, জমিদারী এবং প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। আমি ব্যবসা বাণিজ্য করে ঢাকায় সুনাম কামিয়েছি। আমার কন্যা যেসব গল্প বলতো, সেসব তার বানানো ঝাঐল গ্রামের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প। ঐসব গল্পের কোনো আগামাথা নেই, সত্যতা নেই। কিন্তু লোকজনের কাছে ঐসব গল্প খুব চটকদার। প্রভাবশীল পরিবারের অনেক শত্রু থাকে। আমারও শত্রু আছে। আমার কন্যার ঐসব মনগড়া গল্প আমাদের পরিবারের সুনাম নষ্ট করেছে। পারিবারিক শত্রুরা গল্প শুনে কিছু ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলো। আমরা সেসব সামাল দিয়েছি। এখনও দিচ্ছি।

- আপনি এখনও বলছেন না যে সেই গল্পগুলো কি ছিলো।
- বলবো। কিন্তু পারিবারিক ইতিহাস বলার জন্যে আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি এসেছি আইনী সহযোগিতায় আমার একটা সমস্যার সমাধান করতে। তাই অন্য গল্প শোনার আগে আমি এখানে কেন এসেছি সেটা আপনার জানা দরকার। আমি বরং সেটা আগে বলি।

মাহবুব বিরক্তি সামলে সহজ স্বরে বললো, আমি আগেই বলেছি, আপনাকে আমার প্রশ্নের সঠিক এবং সত্য উত্তর দিতে হবে। নইলে আমার পক্ষে অন্য কোনো গল্প শোনা সম্ভব না। আপনার কন্যা শুচিতা আপনার পিতার মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেই গল্পগুলো বানিয়ে সবাইকে বলতো, সেই গল্পগুলো কি ছিলো, সেটা বলেন।

আবদুল মজিদ খান রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছেন। রাগ সামলে কথা বলার জন্য তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছেন। মাহবুব অবশ্য সেসব নিয়ে বিচলিত না। ও খুব শান্ত ভঙ্গিতে দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখলো। দেরি যখন হয়েই গেছে, ছয়টা পার হলেও এখন আর ক্ষতি নেই। কিন্তু যেই কাজের কারণে দেরি হয়েছে সেই কাজটা ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করা দরকার। আবদুল মজিদ খান শুরু থেকে খুব হম্বিতম্বি দেখিয়েছেন। তাঁর হম্বিতম্বির মুখে চাপ দিয়ে কথা বলতে হবে। নইলে আলাপ এবং সময়ের নিয়ন্ত্রণ দুটাই আবদুল মজিদ খান নিয়ে নেবেন। নিয়ন্ত্রণহীন আলাপচারিতায় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা না গেলে নিজস্বতা নিয়ে কোনো কাজ করার উপায়ও নেই।

মাহবুবের ধারণা আবদুল মজিদ খান একজন কোণঠাসা হওয়া অনিরাপদ মানুষ। তাঁর নিরাপত্তাহীনতার গল্প খুব সহজে তিনি করবেন না। নিশ্চই সেই গল্পেই বাকি কেইসের সূত্র আছে। কারণ এখন পর্যন্ত এই গল্পের মূলে আছে তাঁর কন্যা শুচি। তিনি শুচিকে নিয়ে ব্যাখ্যাতীত কোনো বিপদে আছেন। সেই বিপদের কথা তিনি খুলে বলতে

পারছেন না, কারণ সেখানে তাঁর নিজস্ব কোনো দূর্বলতা লুকিয়ে আছে। এখনকার এই অবস্থানে তাঁকে হম্বিতম্বি করে কর্তৃত্বের খুঁটি গাড়তে হবে। সেই চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন। যদি কাজের কারণেই এখানে বসে তাঁর কথা শুনতে হয়, সেটা মাহবুবের নিজস্ব শর্তে হতে হবে।

- শোনেন মাহবুব... আমার কন্যার উপরে জ্বীনের আছর আছে। কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গার একজন পীরসাহেবের ভক্ত আমি। তিনি শুচিতাকে দেখে এই কথা বলেছেন। জ্বীন যখন আছর করে, শুচি তখন আবোলতাবোল কথা বলে। পীরসাহেব বলেছেন, এসব কথা শুচি বলে না, তার উপরে ভর করে জ্বীন বলে। পাঁচ বছর বয়স থেকে শুচির উপরে এই জ্বীনের আছর।
- জ্বীন-পরী পীর-ফকির এসব ঘটনা আইনের আওতার বাইরে।
- সেটা আমি জানি। আমি বকলম মূর্খ না, ইতিহাসে আমার স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি আছে। একটা ল' কলেজে কিছুদিন আমি আইনও পড়েছি। জ্বীনের আছরে যদি আমার সন্তান আমার পারিবারিক সুনাম এবং ব্যবসার ক্ষয়ক্ষতি করে, তাহলে সেই ক্ষয়ক্ষতির ঠেকানোর জন্য আমি আইনী সহায়তা নিতে পারি। বাংলাদেশের আইনে সেই সুযোগ আছে।

মাহবুব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, শুচিতার কারণে আপনার পারিবারিক সুনাম কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ? সে না হয় নাবালক বয়সে লোকজনের কাছে কিছু মনগড়া কথা বলেছে। বাচ্চাদের কথা শুনে কারও কোনোকিছু বিশ্বাস করারই কথা না, আর সেটার ভিত্তিতে কোন শত্রুই বা আপনার কি ক্ষতি করবে বলেন ? আর সেটা বন্ধ করার জন্য তো পারিবারিক শাসনই যথেষ্ট হওয়ার কথা। আপনি সেই কারণে আইনী সহায়তা চাইছেন কেন ? পুলিশ বা আইন এখানে কি করবে ?

- সেটা বুঝার জন্যেই তো আমি আপনাকে এখনকার ঘটনা বলতে চাচ্ছি। আপনি তো পঞ্চাশ বছর আগের ইতিহাস ঘাঁটায় ব্যস্ত।
- আচ্ছা বলেন ... এখনকার ঘটনা বলেন। আমি শুনছি।

আবদুল মজিদ খান বড় করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। এরপর হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছে কথা শুরু করলেন।

- শুচিতা যখন ক্লাস এইটে, তখন থেকে সে ছদ্মনামে ফেইক একাউন্ট তৈরি করে বেশ কিছু ব্লগে লেখালেখি শুরু করে। সেটা ২০১৫ সালের ঘটনা। ব্লগে সে তার মনগড়া গল্পগুলো লেখে। আমরা প্রথমে কিছু জানতাম না। সেই ব্লগের বিস্তার হয়। তার ফলোয়ার জুটে, এক লেখা থেকে আরও অনেক লেখা আসা শুরু হয়। সেই ব্লগের কারণে কিছুদিনের মধ্যে আমার পিতার ব্যাপারে পুলিশ খোঁজখবরও শুরু করে। আমরা উপরের মহলে যোগাযোগ করে সেই তদন্ত বন্ধ করি। কারণ এসব গল্পের কোনো সত্যতা নেই এবং এসব গল্পের কারণে আমার পিতার এবং আমাদের পরিবারের মানহানী হচ্ছিলো। শত্রুপক্ষ তখন সোচ্চার ছিলো। তারা অনেক পাঁয়তারা করে আমার পিতার এবং পরিবারের দূর্নাম করার চেষ্টায় ছিলো। আমরা ঘরের ইন্টারনেট বন্ধ করি। শুচিকে পাহারায় রাখি যেন সে ব্লগে লেখালেখি না করে।
- এমনও তো হতে পারে যে শুচি ততোদিনে এসব গল্পের সত্যতা খুঁজে পেয়েছিলো ... মানে বলতে চাচ্ছি যে, এমনও তো হতে পারে যে জ্বীনের আছরে না, সে সজ্ঞানেই ব্লগে লিখছিলো।

আবদুল মজিদ খান বাকরুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। রাগে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। মাহবুবের ধারণা তিনি যে কোনো মুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে একটা কিছু বলবেন। তিনি অবশ্য সেটা করলেন না। রাগ সামলে কাঁপা স্বরে বললেন, জি না, সেরকম কিছু না। শুচির উপরে তখনও জ্বীনেরই আছর ছিলো। কারণ সে যেসব গল্প ব্লগে লিখতো, ঝাঐল গ্রামে সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। সরকারি তদন্তেও ঐ গ্রামের রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় আমার পিতার নাম ছিলো না। আমাদের পরিবার কোনো যুদ্ধাপরাধের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না।

- আচ্ছা, বুঝলাম। যদি সেরকম না-ই হয়, তাহলে শুচি ১৯৭১-এর কি গল্প বলতো ? সেই গল্পে যুদ্ধাপরাধের ঘটনাটা কি ছিলো ?

আবদুল মজিদ খান সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি আগের মতোই কাঁপা স্বরে বললেন, শুচির উপরে এখনও জ্বীনের আছর আছে। সে ২০১৬ সালের একটা ঘটনা নিয়ে তার মনগড়া গল্প ব্লগে লিখেছিলো। সেটার কারণে আমার ব্যক্তিগত সুনাম নষ্ট হয়েছে, এবং আমার বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছিলো। আমি সেই তদন্ত বন্ধ করেছি। শুচির এসব গল্পের কোনো সত্যতা নেই।

- ২০১৬ সালের ঘটনাটা বলেন।
- সেটাই আপনাকে বলতে চাচ্ছি। ২০১৬ সালে রোজার মাসে ঢাকার একটা অভিজাত ক্যাফেতে সন্ত্রাসী হামলা হয়। একদল তরুণ সন্ত্রাসী অস্ত্র নিয়ে সেই ক্যাফে দখল করে অতিথি এবং ক্যাফের

কর্মচারীদের হত্যা করে। কিছু অতিথিকে জিম্মি করে তারা আন্তর্জাতিক মাধ্যমে একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠনের জয়জয়কার করে। সেই ঘটনা আপনিও জানেন। শুচি ব্লগে লেখে যে তাদের এই হামলায় আমি অর্থ সহায়তা করেছি এবং এই সংগঠনের সাথে আমার ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও অর্থ পাচারের সম্পর্ক আছে। এসব গল্প মিথ্যে। কারণ তার এই ব্লগের লেখার ভিত্তিতে যখন পুলিশী তদন্ত হয়, তখন আমি প্রমাণ করি যে এসবের সাথে আমার বা আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই।

- আচ্ছা, বুঝলাম। আপনি বলেছিলেন যে ২০১৫ সালে আপনি শুচির ব্লগে লেখা বন্ধ করেছিলেন। ২০১৬ সালে সে ব্লগে কিভাবে লিখলো ?
- সেটা আমি জানি না। আমার ধারণা সে অসৎ সঙ্গে পড়েছিলো। হয়তো তার বন্ধুবান্ধব তাকে সাহায্য করেছে।
- আপনি আমার কাছে কি চান ?
- শুচির ব্লগের লেখাগুলোকে আমি সরাতে চাই। কারণ লেখাগুলো এখনও আছে এবং লেখাগুলোর কারণে আমার পারিবারিক সুনামের ক্ষতি হচ্ছে। আমার পরিবার ক্রমাগত পুলিশী তদন্তের শিকার হচ্ছে। আমি চাই আইনী সহায়তায় আপনি লেখাগুলোকে সরাবেন এবং পুলিশী তদন্ত বন্ধ করবেন। আমি চাই শুচিকে মানসিক চিকিৎসার জন্য গৃহবন্দী করার আইনী অনুমতির ব্যবস্থা আপনি করবেন।

মাহবুব কিছুক্ষণ চুপ থেকে পেশাদারী স্বরে বললো- একটি ব্লগের লেখা বন্ধ করার জন্য আমি তথ্যপ্রযুক্তি আইনের আওতায় আইনী ব্যবস্থা নিতে পারি। কিন্তু শুচি আপনার সন্তান। তার মানসিক চিকিৎসার জন্য তাকে গৃহবন্দী করার অনুমতি কেন চাইছেন সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। যদি আদালত তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য আদেশ দেয়, সেটা হাসপাতালে হবে নাকি ঘরে হবে, সেই সিদ্ধান্ত আদালতই দেবে।

- আমি চাই আপনি সেই সিদ্ধান্তে গৃহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। আপনি সেটা না পারলে আমি অন্য উকিলের কাছে যাবো।
- কেন ? আপনি আপনার মেয়ের চিকিৎসা চাইছেন। সেটা যেখানে ভালো হবে, সেখানেই তো করা উচিত।

আবদুল মজিদ খান মেঘ স্বরে বললেন, সেটা আপনার বিবেচ্য বিষয় না। আপনি জানেন না শুচির মানসিক বিকৃতির অবস্থা কি। তাকে আমরা ঘরে আটকে রেখেছি এবং তার পড়াশোনা বন্ধ করে রেখেছি কারণ সে শুধু আমার পারিবারিক সুনামের না, পরিবারেরও ক্ষতি করছে। জ্বীনের আছর করলে শুচি পাগলের মতো আচরণ করে। জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। পরিবারের মানুষজনকে আঘাত করে। তার অসাবধানতার কারণে ঘরে একটা অগ্নিকান্ড ঘটেছিলো। সেই অগ্নিকান্ডে আমার অসুস্থ পিতার মৃত্যু হয়। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে আমি সেই ঘটনার সত্যতা গোপন করে পুলিশী তদন্তে ধামাচাপা দেই.....

মাহবুবের হঠাৎ মনে হলো কামরার সমস্ত শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। আবদুল মজিদ খানের ঠোঁট নড়ছে কিন্তু মাহবুব তাঁর কথা শুনতে পারছে না। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ বা এয়ারকুলারের বিজবিজ শব্দও নেই। মাহবুবের কানে একটা নিঃশব্দের শব্দ। আর কিছু নেই। মাহবুবের দম বন্ধ লাগছে। খোলা চোখে সব দৃশ্য আগের মতো হলেও ওর মনে হচ্ছে ও এখন আর এই কামরায় নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে মাহবুব শোরগোলের শব্দ পেলো। সেই শোরগোলে কিছু আর্তনাদ। আগুন আগুন চিৎকার। গুলির শব্দ। হাহাকারের শব্দ। মাহবুবের মনে হচ্ছে এসব শব্দের তীব্রতা বাড়ছে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে এসব শব্দ বন্ধ না হলে ওর কর্ণকুহর ফেটে ও মারা যাবে। খুব বেশীক্ষণ এই অবস্থা সহ্য করার মতো শক্তিও শরীরে অনুভব করছে না। মাহবুব মনে মনে বললো- লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন।

অদৃশ্য আর্তনাদের শব্দ ক্ষীণ হচ্ছে। মাহবুবের সামনে বসা আবদুল মজিদ খানের ঠোঁট তখনও নড়ছে। কিন্তু তার কথা মাহবুব শুনতে পারছে না। ওর কানে এখন অদৃশ্য রমণী কণ্ঠে কেউ কথা বলছে। খুব মিহি স্বরে কেউ বললো, মাহবুব স্যার, আপনি আমার কথা শুনতে পারছেন ?

মাহবুব মনে মনে বললো- হ্যা, শুনতে পারছি। তুমি কি শুচি ?

- হয়তো। আমি শুচি, আমি রাশনা, আমি মীরাদেবী, আমি সুলেখা। আমি শিকদার, মোজাম্মেল, কাদের। আমি অনেকে।
- এরা কে ? তুমি কেন শুধু তুমি নও ? তুমি আমার কাছে কি চাও ?
- অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
- আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি কেন আমার সাথে কথা বলছো ?
- আমি এরা সবাই। আমার বাবা আমাকে মেরে ফেলতে চায়, কারণ আমার মাঝে এরা সবাই বসবাস করে। তাই আমার বাবা আমাকে গৃহবন্দী করে রাখার আইনী অনুমতি চাচ্ছেন। কারণ তিনি জানেন, আমি একদিন তাকে মেরে ফেলবো। তাই আমাকে গৃহবন্দী করে তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন। তিনি লোভী, নির্দয় আর বর্বর। তিনি একজন দেশদ্রোহী। তিনি একজন অপরাধী।
- তুমি কেন তাকে মেরে ফেলবে? তিনি অপরাধী হলে আইন তার বিচার করবে।
- কারণ আমি শুচি। আমি অগ্নিস্নানে ধরাকে শুচি করবো। আইন আমার দাদা বা বাবার বিচার করতে পারেনি। তাই আমরা তাদের বিচার করবো।

মাহবুবের ঘোর কাটেনি। তবে এখন ওর অবস্থা আগের মতো অস্থিরতায় নেই। এই কামরায় ওর সামনে বসা আবদুল মজিদ

খান কি বলছেন সেটা নিয়ে মাহবুবের আর কোনো আগ্রহ নেই। ওর এখন মনে মনে শুচির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাহবুব মনে মনে খুব সহজ স্বরে বললো, তুমি আমাকে তোমার ব্লগে লেখা গল্পগুলো বলো। আমি সেই গল্পগুলো জানতে চাই।

- আমি যদি গল্পগুলো বলি, তাহলে আপনি কি করবেন ?
- আমি তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো
- আমার বেঁচে থাকার চেয়ে বেশী জরুরী ন্যায়বিচার। আপনি কি ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করবেন ?
- করবো। কিন্তু আমি চাই না তোমার কোনো ক্ষতি হোক।
- আমার ক্ষতি খুব ক্ষুদ্র একটা ঘটনা। এই দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমার একার ক্ষতি সেখানে খুবই সামান্য।
- তুমি তোমার গল্পগুলো বলো। আমি শুনবো।

এরপর কতোক্ষণ কেটে গেছে সেটা মাহবুব জানে না। শুচি যখন গল্প শেষ করলো, মাহবুবের সামনে তখন আবদুল মজিদ খান উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখেমুখে শঙ্কা আর অনেকগুলো প্রশ্ন। মাহবুব ঘড়ি দেখলো। শুচির সাথে সেই ঘোরের দীর্ঘ কথোপকথনে মনে হচ্ছিলো ঘন্টাখানেক কেটে গেছে। কিন্তু ঘড়ি সেটা বলছে না। ঘড়ি বলছে মাহবুবের ঘোরলাগা ক্ষণ কয়েক মিনিটের ছিলো। এই কয়েক মিনিটে আবদুল মজিদ খান কি বলেছেন তার কিছুই মাহবুব জানে না। সেটা জানার প্রয়োজনও নেই। মাহবুব দৃঢ় স্বরে বললো, আপনি অনেকগুলো সত্য গোপন করেছেন।

- আপনাকে যতোটুকু বলার আমি ততোটুকুই বলেছি। আইনী কার্যকলাপের জন্য আপনার এর চেয়ে বেশী জানার প্রয়োজন নেই।
- ভুল কথা। আমি আপনাকে এখন সেই গোপন কথাগুলো বলছি। আপনার পিতা একজন যুদ্ধাপরাধী। ১৯৭১ সালের মে মাসে স্থানীয় রাজাকারদের সাথে মিলে তিনি ঝাঐল গ্রামের কুমারপাড়ায় আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করেছিলেন। অনেকগুলো হিন্দু পরিবার সেখানে নিহত হয়। সেসব পরিবারে আপনাদের ঘরে কাজ করা রাশনা, মীরাদেবী বা সুলেখারা ছিলো। তাদের হত্যা করে তিনি সেই জমি দখল নিয়েছিলেন। রাজাকারদের প্রভাবে সেই অগ্নিকান্ডের কোনো সুষ্ঠ তদন্ত হয়নি। আর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আপনার পিতাকে গ্রেফতারও করা হয়নি।
- এসব মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে কথা। আপনাকে এসব কে বলেছে ? .... শুচি এসব গল্পই বলতো ... আপনি এসব জানলেন কিভাবে ?
- কথার মাঝখানে কথা বলবেন না। আপনাদের গ্রামের বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিচিত শিকদার, মোজাম্মেল আর কাদের নামের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিয়েছিলেন। আপনি তাদের সাথে ফুটবল খেলতেন। আপনার পিতার নির্দেশে তাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়। সেই বিষ আপনিই মিশিয়েছিলেন। তারা আপনার খেলার বন্ধু ছিলো। সরল বিশ্বাসে তারা আপনার দেয়া খাবার খেয়েছিলো। আপনার পিতা বা আপনি যুদ্ধাপরাধী গ্রেফতার অভিজানে ধরা পড়েননি। আপনারা এসব ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের কেউ এসব সত্য ঘটনার অভিযোগ নিয়ে আসেনি। শুচি এসব ঘটনা জানতো। সেই কারণে শুচি আপনার পিতার ঘরে আগুন জ্বেলে তাকে হত্যা করেছে।
- চুপ করেন। আর একটা কথাও বলবেন না। শিকদার, মোজাম্মেল আর কাদের মুক্তিযোদ্ধা ছিলো না, তারা দেশদ্রোহী ছিলো। তারা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, আর তাই আমি তাদের ঘরে ডেকে আনি। তাদেরকে হত্যা না করলে তারা আমার পিতাকে হত্যা করতো।

মাহবুবের মাথা ঘুরছে। ঘাড় বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। কিন্তু তাতে ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বরং শরীর আর মন হালকা লাগছে। ও কোনোরকম অস্বস্তি ছাড়া সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো, ২০১৬ সালের সন্ত্রাসী হামলায় আপনার সরাসরি সম্পর্ক ছিলো। কিছু তরুণকে প্রলুব্ধ করে আপনারা যেই জঘন্য অপরাধ করেছেন, সেই অপরাধের সাথে সংযুক্ত বিদেশী সন্ত্রাসী

সংগঠনের সাথে আপনি বেনামে অনেকবার যোগাযোগ করেছেন। শিকদার, মোজাম্মেল বা কাদের দেশদ্রোহী ছিলো না, আপনি হচ্ছেন একজন প্রকৃত দেশদ্রোহী ....

- চুপ করেন। আপনি এসব কিছুই জানেন না। এই কাজ আমি না করলে অন্য কেউ করতো। এই কাজ ব্যবসায়িক কাজ, বাংলাদেশে এরকম ব্যবসায়ী অনেক আছে। বরং আমি করায় দেশের ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে। অন্য কেউ করলে এরকম হামলা আরও হতো। আর আপনি জানেন না, এই কাজে সহায়তা না করলে ওরা আমার পরিবারকে গায়েব করে দিতো।
- আপনি শুচিকে ঘরে আটকে রাখতে চান, কারণ আপনার ধারণা শুচি একদিন আপনাকেও আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলবে। আপনি জানেন যে শুচির ব্লগে লেখা সব গল্প সত্য। আপনি তাই একদিন ওকে মেরে ফেলবেন এবং তদন্তে প্রমাণ করবেন যে সেটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো....

আবদুল মজিদ খান হুঙ্কার দিয়ে বললেন- শাট আপ ইউ বাস্টার্ড।

এরপর কি হলো মাহবুবের সেটা মনে নেই। কারণ ওর জ্ঞান ছিলো না।

মাহবুবের যখন জ্ঞান ফিরলো, ও তখন হাসপাতালে। চোখ খুলে যাকে দেখলো, সে ওর স্ত্রী রিমা। রিমার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ, দৃষ্টিতে ঘুমহীনতার ক্লান্তি। মাহবুবকে চোখ খুলতে দেখেও রিমা কোনো কথা বললো না। কথা বললেন রিমার পাশে দাঁড়ানো পুলিশের ইউনিফর্মে একজন অফিসার। শান্ত স্বরে তিনি বললেন, এখন কেমন ফিল করছেন?

মাহবুবের শরীরে ক্লান্তি। সেই ক্লান্তিমাখা স্বরে ও বললো, জি ভালো। আপনি এখানে কেন ?

- আমি এএসপি ইফতেখার। ক্রাইম ব্রাঞ্চ, ঢাকা উত্তর। আপনার পাঠানো টেক্সট মেসেজ পেয়ে আমার ইউনিট আপনার অফিসে গিয়েছিলো। সেখানে আমরা আবদুল মজিদ খানকে গ্রেফতার করি। একজন যুদ্ধাপরাধী এবং দেশদ্রোহীকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

মাহবুব অসংলগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হতভম্ব সেই ভাব কাটিয়ে কথা বলতে ওর কিছুক্ষণ সময় লাগলো। ছোট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বললো- আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কখন আপনাকে টেক্সট মেসেজ করলাম ? আমার যতোদূর মনে পড়ে আমার ফোন তো ড্রয়ারে ছিলো...

- নাহ ... আমরা যখন আপনার চেম্বারে আপনাকে অচেতন অবস্থায় পেয়েছি, আপনার ফোন আপনার হাতেই ছিলো। সেই ফোনে আমরা আবদুল মজিদ খানের সাথে আপনার পুরো কথোপকথনের রেকর্ডিংও পেয়েছি। তথ্য আইনে সেটা করা বারণ হলেও আপনি খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজটা করে আমাদের তদন্তের সুবিধা করেছেন। আমাদের কাছে এখন আবদুল মজিদ খানের পুরো স্বীকারোক্তি আছে। আমরা অনেকদিন ধরে এই অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রমাণ খুঁজছিলাম। আপনার বুদ্ধিমত্তার কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে।

মাহবুব ঢোক গিললো। এরপর ক্ষীণ স্বরে বললো- আমি একটু পানি খাবো।

রিমা গ্লাসে ভরা পানি এগিয়ে দিয়ে বললো- তোমাকে এখন বেশী কিছু ভাবতে হবে না। আর এএসপি সাহেব, আপনার এখনকার আলাপ শেষ হলে প্লিজ ওকে একটু রেস্ট নিতে দেন।

এএসপি ইফতেখারের ইচ্ছেও তেমনই ছিলো। তিনি হেসে বললেন- পরে আরও আলাপ হবে। আপনি রেস্ট নেন।

মাহবুব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো- আপনি নিশ্চিত যে আমার হাতে ফোন ছিলো ?

- জি, আমি নিজেই আপনার হাত থেকে ফোন নিয়েছি।
- সেই ফোন থেকে আপনাকে টেক্সট মেসেজ করা হয়েছে ?
- জি, মেসেজ করে আপনার চেম্বারে আসতে বলা হয়েছে। বেশ বিস্তারিত টেক্সট। টেক্সটে আবদুল মজিদ খানের অপরাধ সম্পর্কে পুরো তথ্যই আছে। আপনি বুদ্ধি করে আলাপের রেকর্ডিংও করেছেন। আপনি সুস্থ হলে সেসব আলাপ আমরা থানায় করবো। আপনার জবানবন্দীও লাগবে। কিন্তু সেসব হচ্ছে ফরমালিটি। ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে, আবদুল মজিদ খানের স্বীকারোক্তিসহ তাকে আমরা হাতেনাতে গ্রেফতার করেছি। তিনি আমাদের কাস্টডিতে আছেন। তার বিচার বিশেষ আদালতে হবে। ন্যায়বিচার এখন আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।
- শুচি কেমন আছে ?

এএসপি ইফতেখার অল্প হেসে বললেন, শুচি ভালো আছে। সে আপনাকে দেখতে এসেছিলো। হয়তো আবারও আসবে। আপনার সাথে কি শুচির আগে পরিচয় ছিলো? মাহবুব সেই প্রশ্নের উত্তর দিলো না। চোখ বন্ধ করলো। মনে মনে বললো, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক

আমাদের কৃষি

করোসল এখন বাংলাদেশে

করোসল বা টক আতা একটি বিদেশি ফল। এটি এখনও বাংলাদেশে ততটা পরিচিত নয়। করোসলের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যানোনামিউরিকাটা। বিভিন্ন অঞ্চলে ফলটি ভিন্ন ভিন্ন নামে সমাদৃত। যেমন গ্র্যাভিওলা, সোরসপ, গুয়ানাভা ও ব্রাজিলিয়ান পাওপাও।

এই ফলের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকায় হলেও সারা বিশ্বে ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে এর কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল করোসলের জন্য বেশ উপযোগী।

করোসল গাছ ২৫-৩০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং অল্প শাখা-প্রশাখা যুক্ত। ফলটির বাইরের আবরণ কাঁঠালের মত কাঁটাযুক্ত, রং সবুজ। ফলের ওজন প্রায় ২৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলটি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি উপকারীও।

গবেষকদের মতে, এই ফল ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। করোসল ফলের ক্যান্সার প্রতিরোধী গুণ প্রথম জানা যায় ১৯৭৬ সালে। এর পাতা, বাকল ও বীজের নির্যাসের রয়েছে অ্যানোনাসিয়াস অ্যাস্টোজেনিন নামে এক ধরনের যৌগ, যা ক্যান্সার কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে কেমোথেরাপির কাজ করে। বিশেষ করে স্তন ক্যান্সার, ফুসফুস, প্যানক্রিয়াটিক, লিভার ও প্রসটেট ক্যান্সারে এটি বেশি কার্যকর। নিয়মিত এই ফল খেতে পারলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যায়। রক্ত শোধিত করতেও এই ফলের গুণ অনস্বীকার্য।

এছাড়াও, করোসল এ রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, যার এন্টিব্যাকটেরিয়াল সক্ষমতার জন্য এর থেকে তৈরি তেল ব্রণ ও চর্ম রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। এই তেল প্রচুর পরিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ যা এন্টিএজিং হিসেবে কাজ করে।

করোসল চাষে বেলে বা বেলে-দোঁআশ মাটি উপযোগী তবে মাটিতে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে।

করোসল ফলের মাঝ বরাবর কেটে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। একটি ফলে মোটামুটি ১২-২০ টি বীজ থাকে। কুসুম গরম পানিতে বীজকে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন একটি ট্রেতে কোকোডাস্ট, ভার্মিকুলাইট মিশিয়ে পিট তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে। ২-৪ সপ্তাহ পর বীজের ট্রে ছায়াযুক্ত স্থান থেকে আলোর সংস্পর্শে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিদিন ৪-৬ ঘন্টা সূর্যের আলোর সংস্পর্শে রাখা বাঞ্ছনীয়। বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা ২৫-৩০ দিনের মধ্যেই টবে রোপণের উপযুক্ত হয়ে যায়।

এই ফলের চারা মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসে লাগানো উত্তম।

চারা রোপণের জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যা দক্ষিণ মুখী এবং সূর্যের আলোযুক্ত। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হতে হবে ১২ ইঞ্চি। নয়তো গাছ উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। গর্ত বড় করতে হবে যেন মূল গভীর পর্যন্ত যেতে পারে। মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর ৩ ইঞ্চি পুরু করে কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য।

করোসল ফলের গাছটি নিজেই নিজের আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারলেও গ্রীষ্মকালে একে আলাদা সেচ দিতে হয়। শীতকালে অতিরিক্ত সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

গাছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম সমপরিমাণে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম বছর একটি গাছের জন্য ২২৫ গ্রাম সার সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে চার মাস পর পর প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় বছর ৪৫০ গ্রাম সার একই ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তৃতীয় বছর থেকে প্রতি বছর ১৩৬০ গ্রাম সার প্রয়োগ করতে হবে।

২য় বছরে গাছের কেন্দ্রীয় অগ্রভাগ এর ৩ ভাগের ১ ভাগ কেটে ফেলতে হবে। এতে কাটা অংশের নিচ হতে নতুন শাখা গজাবে এবং ফলন বেশি হবে। ২-৪ বছরের মধ্যে গাছে ফুল ধরা শুরু করবে।

সাধারণত জুন-জুলাই মাসে ফল ধরে। প্রতিটি গাছে কমপক্ষে ১৫-২০টি ফল ধরে। করোসল ফল হলদে সবুজ হওয়ার সাথে সাথেই সংগ্রহ করা উত্তম। বেশিদিন সংরক্ষণের জন্যে জ্যুস, পালপ তৈরি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে করোসল চাষ হচ্ছে। নীলফামারীর ডিমলা, ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও ফুলবাড়ীয়া, পার্বত্যাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে করোসল চাষে সফলতা অর্জন করেছে। আমেরিকাতে এই গাছের পাতা ও ফল ভালো দামে বিক্রি হয়। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে করোসল চাষ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

টবে চেরি টমেটো

ইতালির ম্যাগোলিয়া রোসা জাতের টমেটো যা চেরি টমেটো নামে বেশি পরিচিত। গাঢ় লাল রং এর আকর্ষণীয় এই টমেটো আঙুরের মতো থোকা থোকা ঝুলে থাকে। দেখতে লোভনীয় এই টমেটো তরকারি হিসেবে কিংবা ভর্তা, সালাদ, আচার এবং টেবিল ডেকোরেশনে এর জুড়ি নেই। এসব ছাড়াও এই সবজি দেখতে আঙুরের মতোই আর এর স্বাদ চেরি ফলের মতো। তাই খাবার টেবিলে এর পরিবেশনও করা যায় ফলের মতোই।

মাটি ও আবহাওয়া

চেরি টমেটোর চাষাবাদ অনেকটা আমাদের দেশীয় জাতের অন্যান্য টমেটোর মতই। সব ধরণের মাটিতে চেরি টমেটোর চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি বেশি উপযোগী। সাধারণত ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা টমেটোর ফলনের জন্য অধিক উপযোগী তাই বাংলাদেশে শীতকাল চেরি টমেটো চাষের জন্য উপযুক্ত সময়।

বীজ বপনের সময়

নভেম্বর ডিসেম্বর বীজ বপন করা হয়ে থাকে। চেরি টমেটো অনেক ছোট হওয়ায় তা বৃদ্ধি পায় খুব তাড়াতাড়ি। এটি ঘরের বারান্দায়, ছাদে টবে খুব সহজে লাগানো সম্ভব।

চাষাবাদ পদ্ধতি

প্রথমে সুস্থ সবল চেরি টমেটোর চারা অথবা বীজ সংগ্রহ করে নিতে হবে। এরপর কোকোপিট- ৫০%, মাটি- ৩০%, ভার্মিকম্পোস্ট-২০%, মিশিয়ে টবের মাটি তৈরি করে নিতে হবে। এরপর একই দূরত্বে টবে বীজ বপন করে এর উপর হালকা লেয়ার করে মাটি দিয়ে দিতে হবে এবং হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। চারা গজানোর ২০ দিন পরে অন্য টবে স্থানান্তর করতে হবে। ছোট টবে ৮০ ভাগ বাগানের মাটি আর ২০ ভাগ কম্পোস্ট সার দিয়ে পরিপূর্ণ করে নিতে হবে। এখানে কম্পোস্ট সার হিসাবে পঁচা গোবর কিংবা ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। টবের ঠিক মাঝ বরাবর চারাটি বসিয়ে দিয়ে, চারার গোড়ার মাটি শক্ত করে দেবে দিতে হবে এবং ভালো করে পানি দিতে হবে। টবগুলি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন ৬-৮ ঘণ্টা সরাসরি সূর্যালোক পায় যাতে এর বৃদ্ধি ভালো হয়, তবে দুপুরের কড়া রোদ যেন না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ১০ দিন পর এই ভালো বৃদ্ধির জন্য আরো দিতে হবে সরিষার খৈল ভিজানো পানি। ২৪ দিন পর যখন ফুল আসা প্রায় শুরু হয় তখন এই গাছগুলোকে

১০-১২ ইঞ্চি টবে স্থানান্তর করা হয়। এই টবে ৫০ ভাগ বাগানের মাটি এবং ৫০ ভাগ কম্পোস্ট সার এর সাথে আরো দিতে হবে ২ চামচ হাড়ের গুড়ো, ২ চামচ শিং কুচি, ২ চামচ সরিষার খৈল গুড়ো, ২ চামচ নিম খৈলের গুড়ো যা গাছকে রোগ-জীবানু থেকে রক্ষা করে। সকল উপাদানকে একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মাটি যদি এটেল প্রকৃতির হয় তবে এর সাথে কিছুটা বালি মিশিয়ে নিতে হবে। এতে জলাবদ্ধতা হবেনা। এরপর ছোট টব থেকে গাছটি মাটিসহ সাবধানে বড় টবে স্থানান্তর করে মাটি দিয়ে টব পরিপূর্ণ করে নিতে হবে, এরপর ভালো করে পনি দিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে একদিন রাখতে হবে। এরপর পুনরায় গাছগুলোকে সূর্যালোকে রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ

এক গ্রাম এনপিকে সার এক লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের পাতার উপর স্প্রে করে দিতে হবে। অথবা প্রতি সপ্তাহে গাছের গোড়ায় সরিষার খৈল ভিজানো পানি, ইপসম সল্ট, ডিমের খোসা দিতে হবে। এছাড়াও গাছের বয়স ১৫ দিন হলে একবার এবং পুণরায় ফুল ফোটার পর আরো একবার ফ্লোরা অথবা মিরাকুলার ১ লিটার পানিতে ১ এম.এল. হিসাবে সকাল বেলায় স্প্রে করলে গাছের বৃদ্ধি যেমন ভালো হবে ফুল থেকে ফলও তেমন সুন্দর হয়। বাজার থেকে কিনে মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট মাসে একবার স্প্রে করা ভালো।

গাছের যত্ন

অতিরিক্ত রোদ, ছায়া বা বৃষ্টি এ গাছের জন্য ক্ষতিকর। নিয়মিতভাবে পানি দিতে হবে। গাছ একটু বড় হলেই শক্ত খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তাহলে ফলন ভালো হবে।

সংগ্রহ

জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত চেরি টমেটো সংগ্রহ করা যায়। প্রতি সপ্তাহে টমেটো তুলতে হয়। টমেটো তোলার পর এক সপ্তাহের অধিক সময় কোনো কিছু ছাড়াই ঘরে সংরক্ষণ করা যায়, কোনো টমেটো নষ্ট হয় না এবং গুনমান অক্ষুন্ন থাকে। বাজারে অন্য সবজীর চেয়ে চেরি টমেটোর তুলনামূলক দামও বেশ ভালো। স্থানীয় বাজারে ভরা মৌসুমে এই টমেটো প্রতি কেজি ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হয়। জেলা শহরে বিক্রি হয় ৫০ টাকা কেজি আর ঢাকাতে বিক্রি হয় ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে। এর বাইরে অমৌসুমী সবজী হিসেবে চাষ করলে প্রতি কেজি ২০০-২৫০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

রপ্তানীযোগ্য শীমের জাত ফ্রেঞ্চ বিন (French bean)

ফ্রেঞ্চ বিন একটি ডাল জাতীয় সবজি। এই শিম অনেকটা বরবটির মতো দেখতে। এটিকে স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন: ফ্রেঞ্চ বিন (French bean), ঘোড়া শিম (Horse bean), ব্রড বিন, ফাবা বিন, কাঠ্যা শিম, ঝাড় শিম ইত্যাদি। প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ এই শিম সবুজ অবস্থায় সবজি হিসেবে আর শুকনো অবস্থায় এর বীজ ডাল হিসেবে দেশে এবং বিদেশে খুবই জনপ্রিয়।

ভারতে ফ্রেঞ্চ বিন ব্যাপকভাবে চাষ হয়। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলেও এর চাষ ভাল হয় এবং এই শিমের বিচি (বীজ) বিদেশে রপ্তানিও হচ্ছে। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে ফ্রেঞ্চ শিম চাষ করা হচ্ছে রপ্তানির উদ্দেশ্যে। বিদেশে প্রবাসী সিলেটিদের কাছে বীজটি প্রিয় বলে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডাসহ কয়েক দেশে তা রফতানি করা হয়। এছাড়া পশুখাদ্য এবং মালচিং ফসল (Cover crop) হিসেবেও বিন বা শুঁটি জাতীয় অন্য ফসলের সঙ্গে এর চাষ করা হয়। 'ফ্রেঞ্চ বিন'-এর চাষ সম্প্রতি মাগুরা জেলায় শুরু হয়েছে। অন্যান্য জেলায় এই প্রজাতির কিছুটা ভিন্ন শিমকে ফেলন বলা হয়। চাষীরা বলে স্বল্প উচ্চতা হওয়ায় মাটিতেই 'ফ্রেঞ্চ বিন' ফলে এবং দুই মাসের মধ্যেই এর ফলন পাওয়া যায়।

ফ্রেঞ্চ বিনের বিভিন্ন জাত রয়েছে। পুসা পার্বতী, বউনটিফুল, অর্ক কোমল, পান্থ অনুপম, সুবিধা, সূর্য এগুলো খাটো জাত। আর কেন্টুকি ওয়ান্ডার, পেন্সিল, পুসা হিমলতা, ব্লু লেক লতানো জাতের ফ্রেঞ্চ বিন।

চাষ পদ্ধতি: ফ্রেঞ্চ বিন চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ মাটি বা কাদা দো-আঁশ মাটিতে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জমি ২-৩ বার ভাল করে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে বীজ বপনের জন্য বেড তৈরী করে নিতে হবে।

বীজ হার: খাটো জাতের জন্য: ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হেক্টর। লতানো জাতের জন্য: ২৫ কেজি প্রতি হেক্টর।

বীজ বোনার সময়: এটি একটি শীতকালীন ফসল। বছরে ২ বার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ফ্রেঞ্চ বিনের বীজ বপন করা হয়।

বীজ বসানোর দূরত্ব: ঝোপ গাছের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সে.মি.

লতানো জাতের জন্য: ৬০-৬৫ সে.মি ১০-১২ সে.মি। শীতকালে মাটিতে সারিবদ্ধভাবে ২-৩ সে.মি. গভীরে একটি করে বীজ বোনা হয়।

সার প্রয়োগ: সাধারণত বলা যায় হেক্টর প্রতি ৩০ টন জৈব সার ও মূলসার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ১২০ কেজি ফসফেট ৫০ কেজি পটাশ সার প্রয়োজন। অর্ধেক নাইট্রোজেন, সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ বীজ বপনের সময় এবং বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন বীজ বপনের ১ মাস পরে দিতে হবে।

মাচা বা খুটি দেওয়া: লতানো জাতের গাছের জন্য মাচা বা খুটি দিতে হবে।

রোগ পোকামাকড়: এনথ্রাকনোজ, পাতার দাগ, পাওডারী মিলডিও রোগ দেখা যায়। পোকামাকড়ের মধ্যে এফিড, ফল ছিদ্রকারী পোকা ও উইভিল এর আক্রমণ হতে দেখা যায়।

ফসল সংগ্রহ: ভালো ফলন হলে হেক্টর প্রতি প্রায় ১০-২০ টন পাওয়া যায়।

সবজির জন্য: বিন সাধারণত জাত অনুযায়ী ৪০-৫০ দিন পর থেকে সবজির জন্য তোলা যায়। ফসল খুব সকালে বা বিকালের পর তোলা ভালো।

ডাল হিসেবে: বিন ১২৫-১৩০ দিনের মাথায় তোলা যায়। এই সময় গাছের কাণ্ড কেটে দেওয়া হয় এবং জমিতেই ফেলে রাখা হয় যার ফলে দানার রঙের পরিবর্তন হয় এবং দানা পুষ্ট ও শক্ত হয় আর পাতাগুলো ঝরে পড়ে।

(সংকলিত)

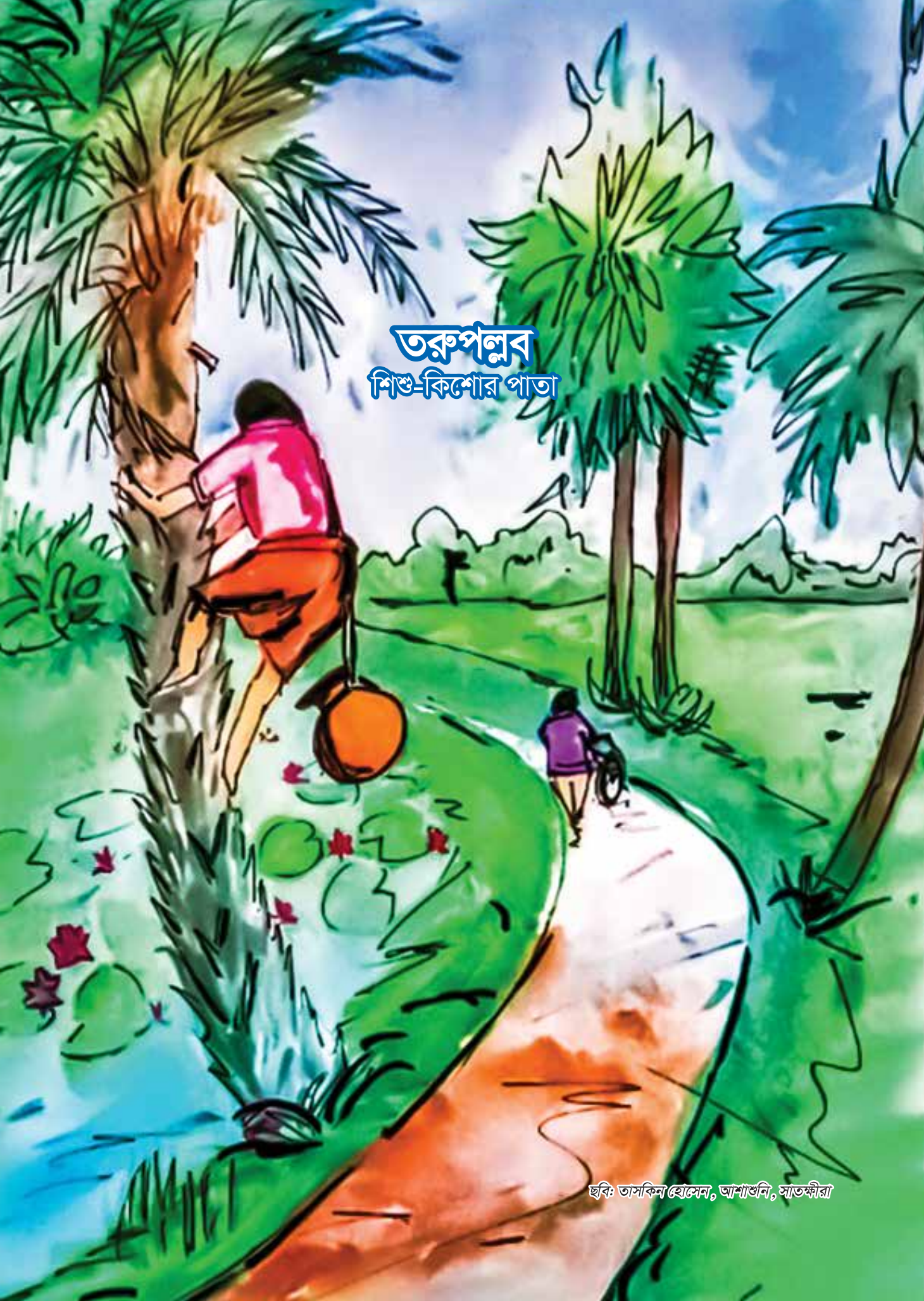

ছবি: তাসকিনা হোসেন, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

শাস্তি

জাপানের লোকগল্প

সে বহু দিন আগের কথা। জাপানের এক গ্রামে গেনগোরো নামে এক লোক বাস করত।

গেনগোরের ছিল একটি জাদুর ঢোল। ঐ ঢোলের একদিক বাজাতে বাজাতে যখন সে বলত 'লম্বা হও নাক, যত পার লম্বা হও।' নাকটিও লম্বা হয়ে উঠত, আর যখন সে ঢোলের অন্য দিক বাজাতে বাজাতে বলত, 'ছোট হও নাক!' নাকটিও সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে যেত। মানুষকে খুশি করার জন্যেও বাজান হত ঢোল। গেনগোরো ঢোলটি বাজাত যারা তাদের নাকটাকে খানিকটা লম্বা করতে চাইত কিংবা যারা তাদের নাকটাকে কিছুটা ছোট করতে চাইত তাদের জন্য। এভাবে সে বহু লোককে আনন্দ দিত।

গেনগোরো খুব কৌতূহলী স্বভাবের মানুষ ছিল। একদিন সে ভাবতে বসল, একটা মানুষের নাক কতটা পর্যন্ত টেনে লম্বা করা যায়-দেখি তো! একটা সুন্দর দিন দেখে সে মাঠে গিয়ে ঢোল বাজাতে থাকে। ঢোলের বোলের সঙ্গে আওড়াতে লাগল- 'লম্বা হও আমার নাক, যত পার হও লম্বা।'

গেনগোরো ঢোল বাজিয়েই চলেছে 'লম্বা হও আমার নাক, যত পার লম্বা হও' বলতে-বলতে। এবার তার নাক দীর্ঘ খুঁটির মতো লম্বা হয়ে গেল। গেনগোরো কিন্তু থামতে পারছে না। ঢোলটি বাজাতে-বাজাতে বারবার একই কথা বলতে লাগল, 'লম্বা হও নাক আমার, যত পার লম্বা হও।'

তার নাক খুব শীঘ্রি কাপড় প্যাঁচানো লাঠির চেয়ে লম্বা হয়ে এতটাই ভারি হয়ে পড়ল যে, সে নিজের পায়ের ওপর আর দাঁড়াতে পারছিল না। মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে নাকটাকে আকাশের দিকে দিয়ে সে তার ঢোল বাজিয়েই চলল। ঢ্যামকুড়াকুড় ঢ্যামকুড়াকুড়, ঢ্যাং- 'লম্বা হও নাক আমার, যত পার লম্বা হও।'

নাকটি লম্বা হচ্ছে তো হচ্ছেই। গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ছাড়িয়ে তার নাকের ডগা সাদা মেঘের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওই সময় স্বর্গে ছুতোর মিস্তিরিরা আকাশ-গঙ্গা নদীর ওপরে বানাচ্ছিল একটি পুল।

গেনগোরোর নাকটি ঠিক সে জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। এক বুড়ো ছুতোর পুলের রেলিং ঠিক করে বসাচ্ছিল। ছুতোর বুঝতেই পারল না যে ওটা একটা মানুষের নাক। সে ভেবেছে যে লাঠিগুলো রেলিঙে বসাচ্ছে, এটা হচ্ছে তারই কোনো একটা। সে একটুকরো দড়ি দিয়ে সেতুর রেলিং-এর সঙ্গে বেশ শক্ত-পোক্ত আর আঁট-সাঁট করে বেঁধে দিল নাকটার ডগা।

এ দিকে গেনগোরো বেচারা মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সে টের পাচ্ছিল যে তার নাক নিয়ে কোথাও একটা গোলমাল বেঁধেছে। যদিও সে ঢোলটি তখনও সমানে বাজিয়ে চলেছিল কিন্তু নাকটি আর কিছুতেই লম্বা হচ্ছিল না। তাছাড়া তার নাকের ডগাও বেশ চুলকাচ্ছিল।

মনেমনে সে বলল, 'নাকটিকে এবারে বরং ছোট করে ফেলি, দেখি কী হয়।' তখন সে ঢোলের উল্টো পিঠে ঘা মেরে বাজাতে-বাজাতে বলতে লাগল, 'হে নাক আমার, এবার তুমি ছোট হও, ছোট্টটি হয়ে যাও।'

কিন্তু গেনগোরোর নাকতো সতুর রেলিং-এর সঙ্গে বাঁধা! তাই যখন ওর নাক গুটিয়ে যতই ছোট হয়ে যেতে থাকল, ততই তার দেহ ওপরের দিকে উঠে যেতে শুরু করল।

'সেরেছে!' সে চিৎকার করে উঠল, 'কেউ আমার নাক চুরি করার মতলব করছে। যা করার আমাকে তাড়াতাড়িই করতে হবে।'

ঢ্যামকুড়াকুড় ঢ্যামকুড়াকুড় ঢ্যাঙর ঢ্যাং- প্রাণের দায়ে সে ঢোলে বাজিয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছল। তখন আকাশ-গঙ্গার আশপাশে কেউ ছিল না। দুপুর হয়ে গেছে ওখানে, ছুতোররা দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি চলে গিয়েছে।

গেনগোরো তার নাকের দশা দেখতে পেল। 'কান্ড দেখো! কেউ ভুল করে আমার নাককে খুঁটি ভেবে নিয়েছে। যত্তসব বেল্লিকা! -মনে মনে ভাবে সে। সে নাকটাকে দড়ির গেরো থেকে খুলে নিয়ে মালিশ করে ঠিকঠাক করে নিল।

এবারে তার আরাম লাগল। কিন্তু এবার সে দেখলো আরোওও ভয়ানক বিপদ তার সামনে। সে পৃথিবীতে ফিরে যাবে কী করে! আকাশ-গঙ্গার পুলের ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

ঠিক অমন সময়, পুলের নিচে সাদা মেঘের দরজা খুলে তার ফাঁক দিয়ে তাকাতেই নিচে সে একটা নীল হ্রদ দেখতে পেল। তার মাথা হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল। ডিগবাজি খেয়ে পড়তে লাগল।

গেনগোরো আকাশ থেকে ডিগবাজি খেতে খেতে ওমি নামে একটা দেশের প্রকান্ড হ্রদ বিওয়া সরোবরে গিয়ে পড়ল। সাঁতার কাটার অনেক চেষ্টা করল সে, কিন্তু শরীরে কুলোচ্ছিল না। নিজের হাত, পা সব হারিয়েছে সে। বদলে একটা ছোট পাখনা আর লেজ গজিয়েছে তার। মুখ আর নাক মাছের মতো চোখা হয়ে উঠেছে। মাছ হয়ে গেছে সে।

শুধু-শুধু কেবলি মজা করার জন্য ঢোল বাজানর ফলেই এই শাস্তি পেতে হল গেনগোরোকে। বিওরা সরোবরে গেলে তোমরা এ রকম অনেক ছোট ছোট মাছ দেখবে, তাদের নাম গেনগোরো-মাছ।

গাঁয়ের শীত

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

শীতের চোটে কাঁপছে মানুষ
কাঁপছে বনের বাঘ,
শীত পড়েছে অনেক বেশি
মাসটি এখন মাঘ।
গ্রামের মানুষ আগুন পোহায়
খড়ে আগুন জ্বেলে,
জোয়ান-বুড়ো সবাই মিলে
খানিক সময় পেলে।
বাড়ি বাড়ি শীতের পিঠা
ছড়ায় মিঠে ঘ্রাণ,
খেজুর গুড়ের পিঠা খেয়ে
জুড়ায় সবার প্রাণ।
শীতে নানান সবজি ফলে
গাঁয়ের সবুজ খেতে,
কৃষকেরা আনন্দেতে
সবাই ওঠেন মেতে।

শীতের সকাল

শাহ আলম বিল্লাল

শীতের সকাল ভালো লাগে
খেতে নাড়ু মুড়ি
গরম জামা গায়ে দিয়ে
করতে ঘুরাঘুরি।
রোদের পরশ পাবো কখন
অপেক্ষাতেই থাকি
খোকন সোনা করবে খেলা
করবে ডাকাডাকি।
শীতের সকাল অনেক ভালো
মিষ্টি রোদের হাসি
শীতের ঋতু তোমায় আমি
অনেক ভালোবাসি।

ছবি: রুহানিকা রুহি, দশম শ্রেণি
পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর

শীত কাহন

জসিম উদ্দিন খান

শীত গিরগির, শীত গিরগির,
পারছি না আর সইতে,
ইচ্ছে আরো লেপের নিচে,
একটুখানি রইতে।
হাড় কনকন, হাড় কনকন,
লাগছে ব্যথা বেশ,
শীত পোশাকে রোদের তা'য়ে
সকল কষ্ট শেষ।
হাত ঝিনঝিন, পা ঝিনঝিন,
গা টানটান ভাব,
কুসুম গরম পানির স্নানে,
শীত বলে বাপবাপ।
ভাব ওমওম, ভাব ওমওম,
কাঁথায় জড়াই বুক,
খেজুর রস আর ভাপা পিঠায়,
পাই যে ভারি সুখ।
শীত হিমহিম, শীত হিমহিম,
যতোই লাগুক গা'য়ে,
এক নিমিষেই দূর হয়ে যায়,
গরম গরম চা'য়ে।

দুষ্ট শিকারি ও চালাক শিয়াল

ইব্রাহিম জুয়েল

প্রায় দুইশত বছরের পুরানো এই জঙ্গল। নানান পশু-পাখি জীব জন্তুর সমাহার এই জঙ্গলে। এই বনের প্রায় আট কিলোমিটার দূরে একটি সুন্দর গ্রাম। গ্রামের মানুষ প্রায়ই তাদের বনে আসেন কাঠ কাঁটার জন্য। তবে ইদানীং মানুষ জন খুব একটা বনে আসেন না, ভয়ে। কারণ ঐ বনে আজকাল বাঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে এবং প্রতিদিন কেউ না কেউ বন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে।

বাঘের ভয়ে গ্রামের লোকরা খুব একটা বনে যায় না বললেই চলে।
তবে সবুজে ঢাকা এই বনটিতে এখন শিকারীদের আনাগোনা। একজন শিকারি প্রতিদিন বনে এসে নির্মম ভাবে বনের পশু-পাখিদের হত্যা করে। এবং বড় বড় হরিণদের জালে বন্দি করে নিয়ে যায়।

কিছুই করতে পারছে না বনের পশু পাখিরা। তারাও আতঙ্কে আছে। শিকারি প্রতিদিন সাথে করে বন্দুক নিয়ে আসে। বন্দুক হাতে দেখে বনের প্রাণীরা ভয়ে পালাতে থাকে। বনের জীব জন্তু সবাই অতিষ্ঠ তার এই কাজে। একদিন সবাই মিলে বনে সভার আয়োজন করলো। বনের রাজা সিংহকে সবাই মিলে নালিশ করলো।
বনের রাজা সিংহ বললো- এটা বড় সমস্যা। আমাদের একটা বুদ্ধি বের করতে হবে শিকারিকে শিক্ষা দিতে হবে। তখন হাতি বলে উঠলো আমাদের শিয়াল মামা এই কাজে সাহায্য করতে পারবে।

সবাই তার কথায় সায় দিল। শিয়ালও না করতে পরলো না। শিয়াল বললো কাল শিকারির একটা ব্যবস্থা করবো। তবে শোন আমার বুদ্ধি- কাল যখন শিকারি আসবে, হরিণ তোমরা তাকে দেখা দিয়ে দৌড়ে পালাবে। তখন আমি শিকারির কাছে গিয়ে বাকিটা দেখ নিব।

পিন পতন নিরবতায় সবাই শিয়ালের বুদ্ধি মত ফাঁদ তৈরি করল।
পরদিন শিকারি আসা মাত্র বনের সকল হরিণ একসাথে দৌড়াতে লাগলো। শিকারি এতগুলো হরিণ একসাথে দেখে ভিষণ খুশি হয়ে গেল। আস্তে আস্তে শিকারি সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তখন শিয়াল শিকারিকে দেখে বলল- শিকারি ভাই, কি খোঁজে যাচ্ছো। আমি কি তোমাকে সাহায্য করবো?
শিকারি: হ্যা, করতে পারো! কিন্তু কি সাহায্য?
শিয়াল: হরিণ গুলো কেন পালালো যান? গতকাল হরিণগুলো সবাই আমাকে বলেছিল তুমি নাকী তাদের বন্দি করতে পারবে না। তারা সবাই নাকী গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। তাইতো সবাই তোমাকে দেখেই দৌড়ে গেলো গুহার দিকে।

:তাহলে এই ব্যাপার! আমি এখনি গুহার মধ্যে যাচ্ছি আজই সবাইকে বন্ধি করবো আমি। এই বলে শিকারি শিয়ালের কথা মতে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। সাথে সাথে হাতি মামা গতকাল সভার বুদ্ধি মত উপর থেকে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। আর গুহার বাঘ শিকারিকে ফেললো খেয়ে। শিকারি আর বাঘ একসাথে শিয়ালের কথার ফাঁদে পড়ে উচিত শিক্ষা পেল। বনের পশুপাখিরা আর গ্রামের মানুষ আবার শান্তি ফিরে পেল।

রাগ
শামীম শাহাবুদ্দীন

আজকে খুকি রাগ করেছে
ক'জন সেটা জানে?
রাকিব মামা পায় না খুঁজে
খুকির রাগের মানে।
যেথায় খুকির পুতুল থাকে
সেখানটাতে ফাঁকা
শান্তিমতো কোনো জিনিস
যায় না কোথাও রাখা।
সব বিষয়ে নাক গলাবে
দস্যি ছোট বোনে
মন যেটা চায় সেটাই করে
নিষেধ কী আর শোনে?
রাগ করে তাই খায়নি খুকি
তাই লেগেছে ক্ষিধে
ভাবছে বসে রাগলে দেখি
ভীষণ অসুবিধে!
ক্ষিধের চোটে চুপটি করে
খাচ্ছে যখন রুটি
আড়াল থেকে সবাই দেখে
হেসেই কুটি কুটি।

ভাঁপা পিঠার ঘ্রাণ
সাঈদুর রহমান লিটন

চুলোর পাশে মিষ্টি হেসে
চালের গুড়ির সাথে,
খেজুরের গুড় মেশানো হয়
মায়ের মিষ্টি হাতে।
পানির হাঁড়ি গরম করে
ঢাকনা বসায় তাতে,
ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা দিয়ে
বাষ্প খেলায় মাতে।
তারই মধ্যে আমার মায়ে
বসিয়ে দেয় পিঠে,
কী দারুণ তার সুবাস আসে
সব হয়ে যায় মিঠে।
ভাঁপা পিঠে ভালো লাগে
গরম গরম হলে,
ঠাণ্ডা পিঠাও ভালো লাগে
সারাটাদিন চলে।

হিম
সুবর্ণা অধিকারী

নীল জোছনা গায়ে মেখে
ছাই কুয়াশায় ভিতর থেকে
আসল নেমে হিম
শীত কাতুরে মাটির ঘরে
বসলো জেঁকে আরাম করে
তাঁ দেয় শীতের ডিম।
ফুটলো মাঘে শীতের ছানা
বরফ মেখে ঝাপায় ডানা
কুলফি খাবার শখ
ছেলে বুড়ো থরোথরো
পথশিশু হচ্ছে জড়ো
হাড় কাঁপে ঠকঠক।
সর্ষে ক্ষেতে মধুপ নাচে
বসন্ত দাড়িয়ে পাছে
ফুটবে আমের বোঁল
যা না রে হিম নীল গিরিতে
রোদের শাবক ধায় সিঁড়িতে
বৃথা হট্ট হট্টগোল।

ছবি: সুবহানা মেহনাজ সোহা
তৃতীয় শ্রেণি, সাতক্ষীরা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, সাতক্ষীরা

ছবি: আহনাফ মাশরুক
প্রথম শ্রেণি, ১৬নং কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কদমতলা, পিরোজপুর

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যে ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ,ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, রংপুর
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫মিঃ	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মিঃ	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি

বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মিঃ	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যে ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যে ৬-৪৩ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিমাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে
'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪

ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক
৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
ঢাকা	ঢাকা - ক - ৬৯৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
	ঢাকা - খ - ৮১৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
		০০:০০ - ০৩:০০	৩:০০
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম - এফএম- ১০৪ মেগাহার্জ এফএম-৯০ মেগাহার্জ	০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	ঢাকা - গ - ১১৭০ কিলোহার্জ	১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম - এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	১৩:৫৭ - ২৩:০০	৯:০৩
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০
	টিএস	১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০
	বিবিসি	১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০
	নিশুতি	২৩:৪৫ - ০৩:০০	৩:১৫
	এফএম - ১০২.০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ০৯:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ৮:৩০	২:৩০
		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
		২১:০০ - ২১:২০	০০:২০
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০
		১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম - ৮৭৩ কিলোহার্জ	৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০- ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
রাজশাহী	রাজশাহী - ৮৪৬ কিলোহার্জ	৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
		১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
খুলনা	খুলনা - ৫৫৮ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	০৪:০০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১৩:০০	৭:০০
		১৪:০৫ - ১৪.৩০	০:২৫
		১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০-২৩:০০	৩:৩০
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
		১৪.৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার		অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
রংপুর	রংপুর - ১০৫৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ১৫:০০ ১৮:২০ - ২৩:১৫	১:০০ ৪:৫৫
সিলেট	সিলেট - ৯৬৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		৭:০০ - ১০:০০ ১৯:০০ - ২৩:০০	৩:০০ ৪:০০
বরিশাল	বরিশাল - ১২৮৭ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫ ১৫:০৫ - ১৫:৫৫ ১৫:৫৫ - ২৩:১৫	৪:৪৫ ৭:২০
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫ ১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৪:৪৫ ৯:২০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও - ৯৯৯ কিলোহার্জ		৬:০০ - ১১:১০ ১৫:০০ - ২৩:১৫	৫:১০ ৮:১৫
রাঙামাটি	রাঙামাটি - ১১৬১ কিলোহার্জ		১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ		১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
কক্সবাজার	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৮:৩০ - ১৪:০৫ ১৮:২০ - ২৩:০৭	৫:৩৫ ৪:৪৭
কুমিল্লা	কুমিল্লা - ১৪১৩ কিলোহার্জ		১১:০০ - ২৩:১৫	১২:১৫
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ০৮:০০ ১১:০০ - ২৩:১৫	১:৩০ ১২:১৫
বান্দরবান	বান্দরবান - ১৪৩১ কিলোহার্জ		১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১১.০০ - ২১.০০	১০:০০
গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০ ১৪:০০ - ২১:০০	৩:০০ ৭:০০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ এফএম ৯২ মেগাহার্জ		৭:৫০ - ২১:০০	১৩:১০
	হোম সার্ভিস শর্টওয়েভ -৪৭৫০ কিলোহার্জ		১২:০০- ২৩:০০	১১:০০
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেহাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঢাকা-৮৮.৮	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	০৭০০-২৩০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
ঢাকা-৯০.০	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম	১৮৩০-০২০০	৫	৯০	৩.৩৩
ঢাকা-১০০	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬০০-১২০০			
	ঢাকা-এফএম ১০০/ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস	১৩০০-১৫০০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৭০০-২৩০০			
	ঢাকা-ক	২৩০০-২৩১৫	৩	১০০	৩.০
	বিশ্ব সংগীত	২৩১৫-০০০০			
	নিশুতি অধিবেশন	০০০০-০৩০০			
ঢাকা-১০৪	ঢাকা ক	০৬০০-০৭৩০			
	ঢাকা খ	০৭৩০-০৮৩০			
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম	০৯০০-১৯০০	১০	১০৪	২.৮৮
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
ঢাকা-১০৬	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-১২০০	১০	১০৬	২.৮৩
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	১৪১৫-২৩১৫			
চট্টগ্রাম-৮৮.৮	এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে)	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	এ.এম এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
		১২০০-১৯৩০			
	এ.এম এর অনুষ্ঠান	১৯৩০-২০০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২১০০			
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	এ.এম এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১৫			
খুলনা -৮৮.৮	ধর্মীয় এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে)	০৬৩০-০৬৪৫			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৪৫-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০০০-১২০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ অনুষ্ঠান	১২০০-১৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯০০-২১০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১৫			
খুলনা -৯০	বিনোদনমূলক ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	১০১৫-১১৩০	৫	৯০	৩.৩৩
		১৯৩০-২৩০০			
খুলনা-১০০.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	০৬৩০-১০০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
		১৪৩০-২৩১৫			

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেহাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
খুলনা -১০২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১	১০২	২.৯৪
সিলেট-৮৮.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম ও ঢাকার অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
সিলেট-৯০ মেগাহার্জ	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-১০০০ ১৯০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২৩১৫	১	১০৫.২	২.৮৫
রাজশাহী-৮৮.৮	ধর্মীয় এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৬৪৫ ০৬৪৫-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-১০০০ ১৪০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০ ১০	৮৮.৮ ৮৮.৮	৩.৩৮ ৩.৩৮
রাজশাহী-১০৪.০	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১৫	৫	১০৪	২.৮৮
রংপুর-৮৮.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
রংপুর-৯০	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রংপুর-১০৫.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	১৭১০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১	১০৫.৬	২.৮৫

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেহাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঠাকুরগাঁও-৯২	এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে) স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১১১০ ১৪০০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	৯২.০	৩.২৬
কুমিল্লা-১০১.২	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০	২	১০১.২	২.৯৬
কুমিল্লা-১০৩.৬	ধর্মীয় এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৬৪৫ ০৬৪৫-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ১৫৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	১০৩.৬	২.৯০
বরিশাল-১০৫.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-১১১০ ১৩৫০-২৩১০	১০	১০৫.২	২.৮৫
কক্সবাজার-১০০.৮	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৯০৫ ০৯০৫-১৬০০ ১৬০০-২১০০ ২১০০-২৩০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
বান্দরবান- ৯২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১৩০-১৬৩০	৫	১০৪	২.৮৮
রাঙ্গামাটি-১০৩.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-১৭০০	৫	১০৩.২	২.৯০
গোপালগঞ্জ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	০৮০০-১১০০ ১৪০০-১৬০০ ১৭০০-২১০০	১০	৯২.০	৩.২৬
ময়মনসিংহ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	০৭৫০-১১০০ ১৪০০-১৬০০ ১৭০০-২১০০	১০	৯২.০	৩.২৬

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন

১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমাপ্তকৃত ৮০টি প্রকল্প, পুনঃখননকৃত ৪৩০টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয় উদ্বোধন এবং নতুন ২০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ধানমন্ডিতে নবনির্মিত জয়িতা টাওয়ার উদ্বোধন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা এসময় উপস্থিত ছিলেন

২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন

২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে শোক প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতা করেন

২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করেন

২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন ২০২৩-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া মরণোত্তর 'ডক্টর অব লজ' অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন

৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সম্প্রতি বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত 'Global Gatway Forum-2023'-এ যোগদান পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন

১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত আখাউড়া- আগরতলা ডুয়েলগেজ রেলওয়ে লিংক প্রকল্প, খুলনা-মোংলা পোর্ট রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প এবং বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট উদ্বোধন করেন

১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জাতীয় কার্ড স্কিম 'টাকা-পে' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলন-২০২৩ এ বক্তৃতা করেন

৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জেলহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন

৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আগারগাঁওয়ে এমআরটি লাইন-৬ এর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পতাকা উড়িয়ে মেট্রো ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন করেন

১০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বিজয় সরণী এলাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ঘিরে নির্মিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' উদ্বোধন শেষে বঙ্গবন্ধুর দেয়াল ম্যুরাল দেখেন

১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে আইকনিক কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন ও রেললাইন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেলের উদ্বোধন এবং প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরসিংদীতে ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন

১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা জেলার বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন

১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে 'দ্বিতীয় ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিট-২০২৩' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অপর প্রান্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন

২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'Virtual G20 Leaders' Summit, 2023'-এ যোগ দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ প্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মানবাধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবতা পালন করেন

বেতার সংবাদ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আগারগাঁওস্থ জাতীয় বেতার ভবনে বর্ণিল অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বেতার ভবন লাল-সবুজের আলোকসজ্জায় সাজানো হয়।

বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক বিজয়ের দিনটির ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে থাকা দেশের গণমানুষের নন্দিত গনমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যায় জাতীয় বেতার ভবন অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও

বাংলাদেশ বেতার মানেই বিজয়ের ছোঁয়া। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে আধুনিক অনুষ্ঠান নির্মানের মাধ্যমে বেতারকে তিনি জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর আহ্বান জানান। পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীসহ বেতারের বর্তমান প্রজন্মের প্রথিতজশা শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র সরাসরি সম্প্রচার করে। অনুষ্ঠানে বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে উল্লেখ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বেতারের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় বিজয়ের দিন বিজয় দিবস এবং বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যুগলের আনন্দের দিন উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ বেতার একই আত্মার বন্ধনে দুটি অস্তিত্ব।
বাংলাদেশ বেতার মানেই স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা,

মহান বিজয় দিবস ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ হতে চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল স্কুলে অবস্থিত শহীদ মিনারে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ মাহফুজুল হক, সিনিয়র প্রকৌশলী সুব্রত কুমার দাস, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোল্লা মোঃ আব্দুল হালিমসহ কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৪ নং স্টুডিওতে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাবেক মুখ্য উপস্থাপক ও বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব মো: ফজল হোসেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদ উল্যাহ। মো: ফজল হোসেন তার আলোচনায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করার ইতিহাস তুলে ধরে বলেন আওয়ামী লীগের সংগ্রামী নেতা এম এ হান্নান ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। তাঁর বক্তব্য হতে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও এর কলাকুশলীদের অবদানের ইতিহাস জানা যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ তাঁর বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্পৃক্ততা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি বেতারের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেন এবং বেতারের কর্মকর্তাদের সততা ও কাজের প্রতি নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরিচালক মো: মাহফুজুল হক, সিনিয়র প্রকৌশলী সুব্রত কুমার দাস, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোল্লা মো: আব্দুল হালিম, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো: আসিফুর রহমানসহ কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের আলোচনায় মহান বিজয় দিবসের মাহাত্ম এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশের সকল স্তরের জনগণকে বদ্ধপরিকর থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরিশেষে বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক মোঃ মাহফুজুল হক তাঁর বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার্থে ও একটি উন্নত দেশ গঠনে দেশের প্রতিটি জনগণকে নিজ নিজ দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩খ্রি. তারিখে সারা দেশব্যাপী মহান বিজয় দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মত এবারও দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে সকাল ৮:০০ টায় তিন শাখার সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিচালক মো: হাসান আখতার, আঞ্চলিক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মমতাজ পারভীন এবং উপ-আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক উম্মে কুলসুম কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে বেতার প্রাঙ্গনে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পরে বেতার ভবনে বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সমাবেশ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, ধ্বনি বিস্তার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ (সোমবার) বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়।

এ উপলক্ষ্যে সকালে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের সম্মেলনকক্ষে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেয়র বলেন, বাংলাদেশ বেতার একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শ্রোতাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা, তথ্য ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ জনপদের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানসমূহ তরঙ্গ সম্প্রচারের পাশাপাশি অনলাইন প্রচারেও সর্বোচ্চ পেশাগত মান বজায় রাখা হচ্ছে। বাংলাদেশ বেতারের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক নিতাই কুমার ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সরোজ কুমার নাথ, মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার সরদার রকিবুল ইসলাম ও খুলনা বেতারের আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মো: নূরুল ইসলাম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খুলনা বেতারের সহকারী পরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান। এতে আলোচক ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. কাজি মাসুদুল আলম, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: মেহেদী হাসান ও খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম নজরুল ইসলাম। মুক্ত আলোচনায় বক্তৃতা করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার অধ্যাপক সাধন রঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, রূপান্তরের নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার গুহ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, অধ্যাপক মো: সিরাজুল ইসলাম, টিটিসির সহযোগী অধ্যাপক মো: মহিবুল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন মিন্টু, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এসএম জাহিদ হোসেন প্রমুখ।

মুক্ত সেমিনারে অতিথিরা বলেন, বাংলাদেশ বেতার দেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ গণমাধ্যম। অ্যাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা পেরিয়ে সারা পৃথিবী থেকে এখন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে তাদের অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সমস্যা সমাধানে এবং সম্ভাবনার পথ খুলে দেওয়ার জন্য অন্যতম একটি কেন্দ্র হলো বাংলাদেশ বেতার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সেই লক্ষ্যেই সারাদেশের মতো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের নানাবিধ কর্মসূচির সঠিক তথ্য তুলে ধরে উন্নত দেশের রূপরেখা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সেমিনারে খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উপপ্রধান তথ্য অফিসার এ এস এম কবীর বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ শিল্পী-কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বেতারের শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এর আগে মেয়রের নেতৃত্বে খুলনা বেতার প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলাকুশলীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর নগরীর গল্লামারী এলাকায় যাত্রা শুরু করে

বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসব মুখর পরিবেশে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। বিজয়ের ৫২ বছর পূর্তির এই দিনে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সকাল ৬:৪৫ মিনিটে একটি বিজয় র‍্যালী বের করা হয়। সকাল ৭:০০টায় জেলা সুরভী উদ্যানে 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে' পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

১৯৬৭ সালের ১৬ই নভেম্বর বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ছাপ্পান্ন বছর পার করে সাতান্নতম বছরে পা রাখলো বাংলাদেশ বেতার রংপুর, যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয় গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে ছিল সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার" শীর্ষক সেমিনার শুরু হয় সকাল ১০:৩০ মিনিটে। স্বাগত বক্তেব্যের মাধ্যমে সেমিনার এর উদ্বোধন হয়। স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এ.এইচ.এম. শরিফ, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার রংপুর। এরপর একে একে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ আল আমিন, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার রংপুর, মোঃ আবু সালেহ, আঞ্চলিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার রংপুর। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এস এম শহীদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি, সেচ ভবন, রংপুর।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদদেরকে স্মরণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩০ লাখ মুক্তিযোদ্ধা ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনদের স্মরণ করেন এবং বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারের প্রতিপাদ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মোঃ তানজীম ইকবাল, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর, মোঃ রাশেদ খান, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর, অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।

সেমিনারের দ্বিতীয় অংশে ছিল মুক্ত আলোচনা। মুক্ত আলোচনায় সাংবাদিক, ডাক্তার, সংবাদকর্মী, সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী, কণ্ঠশিল্পী, ঘোষক-ঘোষিকা, নাট্যশিল্পী, বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রোতামন্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

মুক্ত আলোচনা শেষে সেমিনারের সভাপতি বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের আঞ্চলিক

পরিচালক মহোদয় ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ বক্তব্য রাখেন। তিনি উপস্থাপক, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, আলোচকগণসহ অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। সকলের পরামর্শ অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর বিএডিসি কর্তৃপক্ষ, শ্রোতাক্লাব এবং সেমিনারের আয়োজক কমিটি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬:২০ মিনিটে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের স্টুডিওতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপন করেন আঞ্চলিক পরিচালক মহোদয় ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মো: আল আমিন, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো: আবু সালেহ।
বাংলাদেশ বেতার রংপুরের মনোজ্ঞ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি কেন্দ্রের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ এবং এফএম ৮৮.৮ মেগাহার্জ ও এ এম ১০৫.৬ মেগাহার্জে একযোগে প্রচারিত হয়।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘোষক-ঘোষিকাদের পাঁচটি জুটির সাথে সরাসরি ফোনে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশে বেতার রংপুর কেন্দ্রের সম্মানিত শ্রোতা বন্ধুগণ। অনুষ্ঠানে ফেইসবুক পেইজে তাদের মন্তব্যও পড়ে শোনানো হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল শ্রোতা, শিল্পী, কলা-কুশলী, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মচারী এবং অংশীজনদের শুভেচ্ছা জানান উপ-আঞ্চলিক পরিচালকবৃন্দ এবং সহকারী পরিচালকগণ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন মাহমুদুল হাসান পিন্টু, মো: রায়হানুল ইসলাম, মো: আজিজুল ইসলাম, মোছাঃ জ্যোতি বেগম, বুবলী কুন্ডু, মিনাক্ষী, শাহরিয়া সিদ্দিকী, জিন্নাতুন নাহার, নাসরিন সুলতানা, শেখ ফরিদ অভি। সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার রংপুর। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ পালন

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার সিলেট, কেন্দ্র দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ, দেশাত্মবোধক গান, আলোচনা অনুষ্ঠান ও নাটক এ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বেতার ভবনে মনোরম আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। বিজয় দিবসের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে স্থানীয় শহীদ মিনারে আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বিতভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী বীরদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৩ এবং বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। দিনের শুরুতে সকাল ৮টায় জেলা প্রশাসন কার্যালয় সংলগ্ন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অনিয়মিত শিল্পীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং কুচকাওয়াজ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় বেতার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক প্রকৌশলী আবদুল্লাহ নূরুস সাকলায়েন, উপআঞ্চলিক পরিচালক মুঃ আনসার উদ্দিন, উপবার্তা নিয়ন্ত্রক এ.এম. নূরুল আমিন, সহকারী বেতার প্রকৌশলী সবুজ সরকারসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, অনিয়মিত শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতার বরিশালের আঞ্চলিক পরিচালক কিশোর রঞ্জন মল্লিক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) হাসনাইন ইমতিয়াজ। আলোচকবৃন্দ মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। সবার অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

ঘূর্ণিঝড় 'হামুন' মোকাবেলায় বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কর্তৃক গৃহীত নানা কর্মসূচি

প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'হামুন' গত ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বাংলাদেশ বেতার বরিশাল নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আঞ্চলিক পরিচালক কিশোর রঞ্জন মল্লিক এর সভাপতিত্বে ২৪ তারিখ দুপুর ২ টায় বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখার সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাংলাদেশ বেতার বরিশাল, বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিরতিহীনভাবে ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বেলা ১১টা থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ রাত ১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত রিলে করে। রিলের মধ্যে আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এছাড়া, বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ শওকত আলী, বরিশাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মন্ডল, বরিশালের জেলা প্রশাসক মোঃ

শহিদুল ইসলামসহ পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠির জেলা প্রশাসকবৃন্দ, মৎস্য অধিদপ্তর বরিশাল এর উপপরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বরিশাল জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ নুরুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ শওকত ওসমান, সিপিপি বরিশাল এর উপপরিচালক মোঃ সাহাবুদ্দিন এর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। তিন শাখার কর্মকর্তা, কর্মচারী, অনিয়মিত শিল্পী, ঘোষক/ঘোষিকা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রচার এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সার্বিক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ২১ ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় কক্সবাজার বিমানবন্দর এসে পৌঁছালে কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক ও আঞ্চলিক প্রকৌশলীসহ অপরাপর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। এদিন বিকেল ৪ টায় তিনি স্থানীয় ইউনিসেফ প্রতিনিধি মুনিরা পারভিনের সাথে আলোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) মো: ছালাহউদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং বাংলাদেশ বেতারের ইউনিসেফ প্রকল্পের সহকারি প্রকল্প পরিচালক মো. আল আমিন খান, আঞ্চলিক পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ কবির, বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের সহকারি পরিচালক (অনুষ্ঠান) নাজমুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। মুনিরা পারভিন বেতারের অনুষ্ঠান নির্মাণে ইউনিসেফের সহযোগিতা, ক্লাব সদস্যদের বেতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, কমিউনিটি পর্যায়ে অনুষ্ঠান নির্মাণসহ যাবতীয় বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। বেতারের মহাপরিচালক মানসম্মত, যুগোপযোগী ও শিশুতোষ অনুষ্ঠান নির্মাণে ইউনিসেফের

সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার অনুরোধ করেন। ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে বেতার ভবন স্টুডিওতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় কক্সবাজার কেন্দ্রের শিল্পীদের গান, গায়কী, যন্ত্রীদের পারঙ্গমতার প্রশংসা করেন। তিনি অনিয়মিত শিল্পীদের সম্মানী বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন বলে জানান। ২২ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মরিচ্যা পালং উচ্চ বিদ্যালয়, উখিয়ায় স্কুলভিত্তিক কৈশোরের অগ্রদুত বেতার শ্রোতা ক্লাব পরিদর্শন করেন এবং সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তিনি ক্লাবের সদস্যদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। বেতার অনুষ্ঠান বিষয়ে তাদের চাহিদা জানতে চান যার ভিত্তিতে নতুন অনুষ্ঠান নির্মাণ সম্ভব হবে। তিনি বেতারের অনুষ্ঠান শোনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বেতারের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের বাতিঘর

বরিশাল তথা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের বাতিঘর হিসেবে কাজ করেছেন ভোলার লালমোহনের কৃতিসন্তান অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ। আপাদমস্তক একজন শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল ইসলামিয়া কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন।

এছাড়াও তিনি যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সাবেক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

একইসাথে তিনি বরিশাল বিভাগে গড়ে তুলেছেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। সংগ্রামী এই শিক্ষক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন।

২০০৮ সালে যখন দলীয় প্রতীকে সিটি ও পৌর নির্বাচন হতোনা- তখন বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নাগরিক পরিষদের মেয়র প্রার্থী

অ্যাডভোকেট শওকত হোসেন হিরণের প্রধান নির্বাচনী সমন্বয়ক ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ। শওকত হোসেন হিরণের বিজয়ের নেপথ্য নায়ক ছিলেন তিনি।

প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ধলিগৌড়নগর ইউনিয়নের চতলা গ্রামে ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা- মুন্সী মকবুল আহমেদ, মা- ফাতেমা বেগম। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই সম্পন্ন করেন। চতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি এবং সেখান থেকে প্রাথমিকের পাঠ শেষ করেন। লালমোহন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫০ সনের ৪ নভেম্বর ইন্টারমেডিয়েটে ভর্তি হন সরকারি ব্রজমোহন কলেজে।

বিএম কলেজ থেকে তিন তিনটি বৃত্তি নিয়ে ১৯৫২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও ১৯৫৪ সালে স্নাতক কোর্স সম্পন্ন করেন। প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হওয়ার কারণে প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত বৃত্তি লাভ করেন। এরপরে ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। নিজের পড়াশোনার ব্যয়ভার নিজেই বহন করেছেন আত্মপ্রত্যয়ী মোহাম্মদ হানিফ। তার ভেতরে বিএম কলেজের শিক্ষক হওয়ার অদম্য স্বপ্ন ছিল। অবশেষে স্বপ্নপুরণ। ১৯৫৮ সনের আগস্ট মাসে সরকারি ব্রজমোহন কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক, হিসেবে যোগদান করেন।

যেহেতু প্রান্তিক পরিবারে জন্ম, অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও নিজের লেখাপড়া ছাড়াও পিতা-মাতাকে সহযোগিতা করেছেন। ১৯৫৯ সনে পিএইচডি স্কলারশিপ, ১৯৬১ সনের ফুলব্রাইট স্কলারশিপ, ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডে স্কলারশিপ, ১৯৭৮ সনের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েও যাওয়া হয়নি পরিবারের প্রেক্ষাপট, বরিশাল এবং বিএম কলেজ ও হাতেম আলী কলেজের ভালোবাসার টানে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপে না য়াওয়ার কারণে শোকজও হয়েছে।

১৯৬১-৬৩ সনে লাহোরে সিভিল সার্ভিস একাডেমির ফাইন্যান্স সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। ডেপুটেশন শেষে আবার বিএম কলেজে ফিরে এসেছেন। তৎকালীন অধ্যক্ষ মেজবাহুল বার চৌধুরীর উদ্যোগে ব্রজমোহন কলেজে চালু করা হয় অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান কোর্স। অধ্যক্ষের অনুরোধে আবার বিএম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অনার্স বিভাগ পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করেন। প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ ১৯৫৮ সনে বিএম কলেজে যোগদান করে অর্থনীতি বিষয়ের প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান ও শেষে কলেজ অধ্যক্ষ হিসেবে বর্ণাঢ্য পেশাগত জীবন অতিবাহিত করেন।
বিএম কলেজের অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ডেপুটেশনে ৩০. ০৪. ১৯৭৩ খ্রিঃ থেকে ৩১. ১২. ১৯৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তৎকালীন বেসরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ ও বরিশালের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ০৮. ১২. ১৯৮৮ থেকে ৩০. ১২. ১৯৯২ পর্যন্ত বিএম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিএম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে তিনি কলেজের শিক্ষা ও অবকাঠামোর আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের সত্য-প্রেম-পবিত্রতার মূল আদর্শকে ধারণ ও লালন করার প্রয়াস চালান। বরিশালকে ভালোবেসে যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অনেক লোভনীয় পদ ও পদবীর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন হানিফ স্যার। সরকারি চাকুরি থেকে অবসরের পরে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত বরিশাল ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বরিশাল ছিলো হানিফ স্যারের স্বপ্ন ও ভালোবাসার আবাসভূমি।

প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ বরিশালের অক্সফোর্ড মিশন রোডের 'বিমলাধাম' নামক বাড়িতে পরিবারসহ বসবাস করতেন। তিনি ২০২১ সালের ১ লা মার্চ, (১৬ই ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য জটিলতায় ঢাকাস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২ মার্চ তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান সরকারি ব্রজমোহন কলেজের মূল ভবনের মাঠে জানাজা শেষে বরিশাল মুসলিম গোরস্তানে দাফন করা হয়। স্যারের সহধর্মিণী মিসেস রওশন আকতার জাহান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফের চার ছেলে পারভেজ হানিফ- বসুন্ধরা গ্রুপের কর্মকর্তা, সোহেল আহম্মেদ- ব্যবসায়ী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ সাব্বির - বরিশালস্থ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এ টেলিকমিউনিকেশন বিষয়ের শিক্ষক, আবু মোহাম্মদ ফয়সাল মাসুক- মেঘনা গ্রুপের কর্মকর্তা এবং দুই মেয়ে যথাক্রমে মিসেস হানিফ পারভীন লিনা- জীবন বিমা কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নাহিদ ইসলাম- গৃহিনী।

মৃত্যুকালে প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ বরিশাল সাহেবেরহাট শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ, বাকেরগঞ্জ রাণিরহাট বেগম শামসুদ্দীন তালুকদার ডিগ্রি কলেজ, এবং বরিশাল গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি জন্মস্থান লালমোহন, ভোলা এবং বরিশালে নিজ হাতে পরম মমতায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎসাহী সদস্য ছিলেন।

বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় হানিফ স্যারের নিরলস নেতৃত্ব ও ভূমিকা বরিশালবাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তিনি পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড ও ২০১১-২০১৫ মেয়াদে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি। আমৃত্যু প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িকতা চর্চা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শিক্ষা সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের চিন্তা, মনন ও প্রত্যয়ের বাতিঘর। প্রাকৃতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অভিষিক্ত মেধাবী শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ শিক্ষকদের শিক্ষক, অধ্যক্ষের অধ্যক্ষ- সর্বোপরি শিক্ষার বাতিঘর ছিলেন তিনি।

লেখক: আযাদ আলাউদ্দীন

বেতার

অ্যালবাম

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি-কে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের পরিবেশনা

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পীবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ হতে চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল স্কুলে অবস্থিত শহীদ মিনারে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে বেতার প্রাঙ্গনে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিজয়ের ৫২ বছর পূর্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাতে জেলা সুরভী উদ্যানে 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে' পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পুষ্পস্তবক অর্পণ

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু, বিজয় ও আজকের বাংলাদেশ' এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন- ডান থেকে বিশিষ্ট নাট্যজন সৈয়দ দুলাল; মো: আরিফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি বিভাগ), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর (অবঃ) দীপংকর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব; সঞ্চালক কে. এম মনিরুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান 'চেতনায় মহান বিজয়' এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শওকত আলী (অতিরিক্ত সচিব); সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অধ্যাপক জাহিদ হোসেন

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটার ও প্রার্থীদের করণীয় বিষয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান 'ভোটের হাওয়া' এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বরিশালের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম; সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন অধ্যাপক জাহিদ হোসেন

জেল হত্যা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার বরিশাল থেকে প্রচারিত আলোচনা অনুষ্ঠান "জেল হত্যা- ইতিহাসের কালো অধ্যায়" এ অংশগ্রহণকারী ডান থেকে বামে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজল কুমার ঘোষ; বিশিষ্ট সাংবাদিক সাইফুর রহমান মিরণ (সঞ্চালক); এ্যাড. মুনসুর আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বরিশাল

শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার বরিশাল থেকে প্রচারিত আলোচনা অনুষ্ঠান 'শেখ রাসেল-এক ভালবাসার নাম' এতে অংশগ্রহণ করেন- ডান থেকে বামে প্রকৌশলী মো: শফিকুল ইসলাম হাওলাদার, সভাপতি, শেখ রাসেল শিশু কিশোর পরিষদ, বরিশাল; মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, বরিশাল; সঞ্চালক, শেখ কামরুন নাহার কাদির, সহকারী অধ্যাপক, শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি কলেজ, বরিশাল

শীতের চিঠি

জমছে ঘাসে শিশির কণা
কমছে দিনের আয়ু
শীতের চিঠি আনলো বয়ে
হালকা হিমেল বায়ু।

লিখছে চিঠি শীতের বুড়ি
আসবে ক'দিন পর
সঙ্গে নিয়ে হিম কুয়াশা
কাঁপুনি থরথর।

মিষ্টি খেজুর রসের কথা
চিঠির মাঝে আছে
লেখা আছে রসের ঘটি
ঝুলবে খেজুর গাছে।

শীত সকালে পিঠাপুলি
খাবে ঘরে ঘরে
মিষ্টি রোদের ছোঁয়ায় যাবে
আনন্দে মন ভরে।

টুপটাপ টুপ শিশির কণা
পড়বে টিনের চালে
মাখবেন মা লোশন, ক্রিম
শিশুর নরম গালে।

আবদুল লতিফ
মহাখালী, ঢাকা

জোনাকির দাবি

জোনাকিরা বলে ওঠে মুখ করে ভারী
খাটতে খাটতে আর সইতে না পারি,
আজীবন ধরাধামে দিচ্ছি তো আলো
জোনাকিরা কেনো তবু এত অগোছালো?

মানুষেরা মাঝে মাঝে বলো কেনো কয়?
জোনাকির এ আলোয় কাজ নাহি হয়!
ধরণীকে আমরা যে এত আলো দেই
তবু কেন সে আলোর স্বীকৃতি নেই?

কাজে কভু জোনাকিরা দেয় নাকো ফাঁকি
বিনা দামে আর কেউ আলো দেয় নাকি?
আশেপাশে যে বা যারা কোন আলো দেয়
সকলেই আলো দিতে বিনিময় নেয়।

মাটির প্রদীপও নেয় কেরোসিন তেল!
স্বার্থ বিহীন কাজে মোরা কেন ফেল?
উপকারী জোনাকির ঘোর সন্তাপ
না মানলে এ দাবিটা হবে মহাপাপ!

খানাদানা টাকা কড়ি কোন চাওয়া নাই,
শুধু নিজ কর্মের স্বীকৃতি চাই।

কোমল দাস
শাহবাগ, ঢাকা

দাও বাড়িয়ে হাত

পথের ধারে থেকে যারা
কষ্টে কাটায় রাত
দাও বাড়িয়ে তাদের তরে
একটু তোমার হাত।

গরম কাপড় গায়ে তুমি
আরাম যে পাও খুব
তাদের কথা চিন্তা করে
যাও কী হয়ে চুপ!

নেই তো তাদের গায়ে জামা
নেই তো কোনো ঘর
কষ্টে কাটে জীবন তাদের
কষ্ট জীবনভর।

একটি জামা দাও পরিয়ে
তাদের খালি গায়
গরম কাপড় গায়ে তারা
যেন আরাম পায়।

জোবাইদুল ইসলাম
মীরসরাই, চট্টগ্রাম

রক্ত করো দান

সুস্থ সবল দেহ তোমার, সাহস আছে বুকে
রক্ত দান করতে পারো তুমি হাসি মুখে।
হতে পারো হিন্দু তুমি কিংবা মুসলমান
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রক্ত করো দান।।

তোমার দেহের রক্ত কণা দিলে তুমি যারে
হয়তো বা সে পুণঃ জীবন ফিরে পেতে পারে।
ভোরের সূর্য দেখবে আবার, শুনবে পাখির গান
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রক্ত করো দান।।

তুমি তো তোমারই নও, রক্ত তবে কার?
রক্ত হলো মহান রবের দেয়া উপহার।
অসহায়কে দানের কথা বলেছে কোরআন
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রক্ত করো দান।।

আমরা মানুষ সৃষ্টিকূলের সেরা এবং বড়
তাইতো সবাই রক্ত দানের মনোবৃত্তি গড়ো।
রক্তহীনা মুমূর্ষু এর সজীব করো প্রাণ
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রক্ত করো দান।

এ কে এম মোস্তফা
কুমারখালী, পিরোজপুর

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ এখন থেকে পূর্বের অন্যান্য মাধ্যমের পাশাপাশি ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন 'নগদ' এর মাধ্যমেও গ্রাহকচাঁদা পরিশোধ করতে পারবেন। এজন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

ক) 'নগদ' অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে:

নগদ অ্যাপ-এ লগইন করুন | মার্চেন্ট পে বাটনে ক্লিক করুন | মার্চেন্ট মোবাইল নাম্বার টাইপ করুন | অথবা কিউআর কোড স্ক্যান করুন | টাকার পরিমাণ টাইপ করুন | আপনার রেফারেন্স ও পিন টাইপ করুন | ট্যাপ করে ধরে থাকুন | পেমেন্ট শেষে আপনি একটি কনফার্মেশন মেসেজ পাবেন

খ) মোবাইল ফোনে ডায়ালের মাধ্যমে:

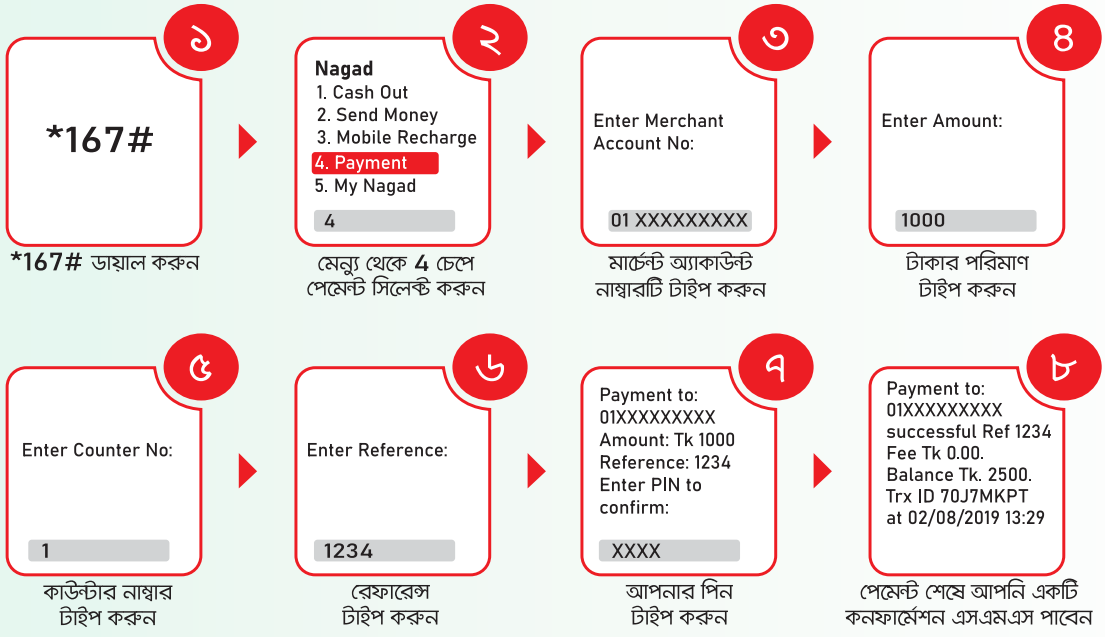

*167# ডায়াল করুন | মেন্যু থেকে 4 চেপে পেমেন্ট সিলেক্ট করুন | মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি টাইপ করুন | টাকার পরিমাণ টাইপ করুন

কাউন্টার নাম্বার টাইপ করুন | রেফারেন্স টাইপ করুন | আপনার পিন টাইপ করুন | পেমেন্ট শেষে আপনি একটি কনফার্মেশন এসএমএস পাবেন

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে 'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪
ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক ৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বেতার ভবন মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি'র হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বেতার ভবন মিলনায়তনে বিজয় দিবস ২০২৩ ও বাংলাদেশ বেতারের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তৃতা করেন

১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'শেখ রাসেল দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান বিজয় দিবসে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন